Rai Ram Akshoy Chattopadhyaya Bahadur.

নিকাস-আখেরি

বা

পরিণাম।

রায় শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে মুদ্রিত।

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল্ লাইব্রেরিতে
বিক্রীত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ॥০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

হে লোকান্তরিত ভ্রাতৃবৃন্দ! হে অবসথি-কুলচন্দ্র প্রেমচন্দ্র, গুণাভিরাম শ্রীরাম ও সীতারাম এবং স্নেহময় রামময়! অনুজ হইয়া আমি কেবল লোকান্তর-যাত্রা-বিষয়েই আপনাদিগের পদানুসরণ করিতে বসিলাম এমত নহে; গুণ, জ্ঞান এবং ধর্ম্মার্জ্জন আদি সকল বিষয়েই চিরদিন হীনমতি কনিষ্ঠ থাকিয়াই গেলাম। ইহাতে দুঃখিত বা ক্ষুভিত নহি; বরং আপনাদিগের গুণানুরক্ত ও অনুপযুক্ত কনিষ্ঠ বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিতে যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার অপার শ্লাঘা। তবে ক্ষোভের বিষয় এই যে, অতিথিপরায়ণ পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺রামনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত এবং আপনাদের সকলের অভিমত, স্বদেশে অতিথিসৎকার-ব্রত যাবজ্জীবন পালন বা সম্যক্‌রূপে উদ্‌যাপন না করিয়া এখানে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। সঙ্কীর্ণমতি অকর্ম্মা অনুজ আমি, যে যে কারণে এই বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ঈশ্বর জানেন। আপনারাও এখন দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্যামী;

আপনারা এ অধমের মনের ভাব বুঝিয়া ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আর একটী নিবেদন;—আপনাদের চরণ-প্রান্তে বসিয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্মগাথা ও নানা উপদেশকথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তখন আমি রজোগুণোদ্রিক্ত ও ঘোর বিষয়াসক্ত ছিলাম। নিজ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করি নাই। এখন দারাপুত্র হারাইয়াছি, পার্থিব বিষয়-রসের অসারতা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি এবং ইহলোকের অনিত্যতা অনুভব করিয়াছি; এখন এখানে নির্জ্জনে বসিয়া নিখিলনিয়ন্ত্রী শ্রীমতী অপর্ণাদেবীর আদেশমতে শ্রীলশ্রীযুক্ত ৺বিশ্বনাথ বাবার দরবারে দাখিল করিবার জন্য এ অকর্ম্মণ্য জীবনের যে শেষ হিসাব প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা ভক্তিভরে আপনাদের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। আপনারা ইহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া এ অভাগা অনুজের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন। ইতি।

৺বারাণসী। ১৬ই কার্ত্তিক। সন ১৩১১ সাল।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

নিকাস-আখেরি

বা

পরিণাম।

"আজ কেন "মনে কর শেষেরও সে দিন ভয়ঙ্কর"—এই মহাজন-বাক্যটী অকস্মাৎ মনে উদয় হইল? এই সঙ্গে সঙ্গে "স্মর নিত্যমনিত্যতাম্"—এই শ্লোকাংশটী মনে পড়িল! মন যে অমনি বিচলিত ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। চট্‌কা কি ভাঙ্গিল? ইহা কি তন্দ্রা? অথবা প্রকৃত জাগরণ? জাগিয়াও জাগিতেছি না! অজ্ঞান-নিদ্রার ঘোর যে কাটিতেছে না। নিদ্রায় বা তন্দ্রায় কতই ভীষণ কতই বা চিত্তরঞ্জন স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপনে কাহাকেও যেমন আপন বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না, জাগিয়াও ত ঠিক্ সেইরূপই বুঝিলাম। "কে আমি কার" আগে তারই ত নিরূপণ হইল না। বোধ হয়, এ মায়ার মুলুকে মায়াবদ্ধ জীব দ্বারা এই তত্ত্বের কখন নিরূপণ হইবে না। অথবা কর্ম্ম-সম্বন্ধসূত্রে আপনও পর এবং পরও আপন হইয়া উঠে;—এই ব্যাপারই ত সর্ব্বত্র দেখা

যাইতেছে। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, ইহলোকে আপন-পর সম্বন্ধ একান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমিও ত অনেক দিন বাঁচিলাম ও অনেক দেখিলাম।

এই বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে কাহাকেও অজর, অমর বলিয়া দেখিলাম না বা শুনিলাম না। দেখিলাম,—এই অনন্ত-সময়-সাগরে জীবগণ নিরন্তর ডুবিতেছে ও উঠিতেছে। আমিও অমর নহি; দেহে জরার পূর্ণ বিকাশ দেখিতেছি; আমিও একদিন ফস্ করে ডুবিব বুঝিতেছি। ডুবিব ত স্থির বটে, কিন্তু আবার কি উঠিব? যদি ডোবা, উঠা, যাওয়া, আসা অনিবার্য্য, তবে যাই কেন? আবার আসি বা কেন? যদি জন্ম হইতে জন্মান্তর ও মৃত্যু হইতে মৃত্যু ধারাবাহিকরূপে চলিতেই থাকিল, তবে কি কখনও ইহার অবসান হইবে না? এই দুস্তর পারাবারে পাড়ি কি কখনও জমিবে না? আমিই যে বারবার আসিতেছি, তাহাও কি কখন বুঝিতে পারিব না? এই সংসার-নেপথ্যে কালরূপ যবনিকান্তরালে কে বা আমায় কত সাজে সাজাইয়া এই মর্ত্ত্য-রঙ্গে পাঠাইতেছে ও কত নাটে নাচাইতেছে তাহাও কি কখন বুঝিতে পারিব না? এবার আসিয়াই বা কিরূপ নাচিলাম? এবারকার নির্দ্ধারিত পালার কিরূপ অভিনয় করিলাম? আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কত দূর বা সাধন করিলাম? সাধন সিদ্ধ হইল

কি না? সাধনসিদ্ধির প্রকৃত চিহ্নই বা কি প্রকার? কেনই বা জীব সমস্ত লীলা সম্পূর্ণ না করিয়া অকৃতকর্ম্মা ও অপূর্ণকাম হইয়া চলিয়া যায়? কোথায় বা সকলে যাইতেছে? আমিই বা কোথায় যাইব? পরিণাম বা কিরূপ দাঁড়াইবে? এই সকল প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত উত্তর বা কোথায় পাইব? হে মানব! তুমি জন্য ও মর্ত্ত্য হইয়াও আপন জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝিতে পারিলে না? সোণার বেণে নাম বলালে, সোণা চিনিলে না? এখন এ রহস্য বুঝিবার উপায় কি? সেই অনাবিষ্কৃত মৃত্যুভূমি-পরিসর হইতে এপর্য্যন্ত একটী পান্থ প্রত্যাগত হইল না যে তাহার মুখে তত্রত্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। আসিবার সময়ে একাকী অজ্ঞান অবস্থায় আসিয়াছি। আসিয়া যাহা দেখিতেছি, তাহাতে যাইবার সময়ে সেই অজ্ঞানমাত্র সহচর লইয়াই যাইতে হইবে বুঝিতেছি। কাজেই এখানকার সেখানকার বৃত্তান্ত যুগপৎ অবগত হওয়ার উপায় দেখিতেছি না। এই রহস্য-সমুদ্ভেদে শাস্ত্রের সাহায্য সম্যক্ সন্তোষজনক বোধ করিতে পারিতেছি না।

কোন শাস্ত্রমতে এই ভৌতিক দেহই মনুষ্যের যথাসর্ব্বস্ব। ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গ্রামের যথেচ্ছ ব্যবহারই প্রকৃত সুখ এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধই দুঃখ। এই দেহাত্যয়েই সুখদুঃখের অবসান। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, পরলোক নাই, কৃত কার্য্যের দায়িত্ব নাই। ইচ্ছামত

খাও দাও এবং অকুতোভয়ে ক্রীড়াকৌতুক করিয়া চলিয়া যাও। পৃথিবীতে এই শাস্ত্রের উপাসকের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন জাতির শাস্ত্রমতে ইহজীবনে যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহারই স্বর্গসুখ পুরস্কার অব্যাহত। ইহার অন্যথায় মানবের নরকভোগ অনিবার্য্য ও কোটি কোটি যোনিতে পরিভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

শাস্ত্রান্তর পাঠে জানা যায়, জীবনান্তে পরলোকে অন্য হইতে পুরস্কার বা তিরস্কার নাই। এই পার্থিব-জীবন-সময়ে সদসৎ চিন্তা ও সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল অনুসারে জীব উন্নতি বা অধোগতি ভোগ করিয়া থাকে। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ এবং চেতন আত্মা এই তিনটী জিনিস লইয়া মানবদেহ গঠিত। অবসানসময়ে স্থূল দেহ অর্থাৎ পার্থিব দেহ এইখানেই পড়িয়া থাকে। চেতন আত্মার ধ্বংস নাই। সেই অবিনাশী আত্মা সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীর লইয়া সরিয়া পড়েন। অনন্তর নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মফলের ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে অনন্ত জন্ম পরিগ্রহ করিতে করিতে ক্রমশঃ উপার্জ্জিত সঞ্চিতের তারতম্য অনুসারে উন্নত পদ ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে চিরনিবৃত্তি লাভ করিতে পারেন।

এখন নানা সংশয় উপস্থিত। কর্ম্মফলের হিসাব দিতে হইলেই ত বড় গোলযোগ। এবারকার ধর্ম্মকর্ম্মের জমা-ওয়াশীল-বাকি দেখাইতে হইলে কি করিব ও কি বলিব বুঝিতে পারিতেছি না। এজন্মে এইরূপ কর্ম্মের নগদ সওদা কখনও করিয়াছি কি না, মনে হইতেছে না। পূর্ব্বজন্মকৃত এইরূপ কর্ম্মের জের টানা হইবে কি না বুঝা যাইতেছে না। জের টানা হইলেও তাহা জমার অংশে পড়িবে অথবা ওয়াশীলে পড়িবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কাজেই জমারও স্থিরতা নাই ওয়াশীলেরও ঠিকানা নাই। এখন এবিষয়ে নূতন খাতা পত্তন করিলেই বা কি হইবে? দিন সংক্ষেপ দেখিতেছি। এখন আরম্ভ করিলে নূতন সুকৃতের ফল-সমষ্টি অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। সদসৎ চিন্তার তহবীলেও গোলযোগ দেখিতেছি। যতদূর মনে পড়িতেছে তাহাতে সৎকামনা ও অসৎকামনার জমাখরচ কাটিলে অসৎ-কামনাই ফাজিল দাঁড়াইবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার নিয়ম-মাহাত্ম্য একেই ত অতি গহন ও দুর্ব্বোধ। তাহাতে শাস্ত্রকারগণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সমধিক জটিল ও দুর্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি ত নিরাময় নির্ব্বিকার! তোমাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পাপপুণ্য নাই, ভূতভবিষ্যৎ কিছুই নাই। তথাপি শাস্ত্রকারগণ তোমার অবোধ

সন্তান মানবের নিকটে পূর্ব্বাপরজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুকৃত দুষ্কৃতের কৈফিয়ৎ দিবার ভয় দেখান কেন? "স বা২য়মাত্মা ব্রহ্ম", "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র মানিতে হইলে, হে ঈশ্বর! তোমারই উপরে সমুদয় দোষ ফেলিতে হয়। তুমি চিন্ময় ও সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও কেন যথাসময়ে জীবকে দুষ্প্রবৃত্তি ও দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা কর না? ও সৎপথ প্রদর্শন কর না? ইহা তোমারই দোষ বই আর কি বলিব? কেনই বা তুমি নির্গুণ ও নির্লিপ্ত হইয়াও এই ষট্‌কোষময় মানবদেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাও ও দেহী মানবকে কষ্ট দাও? কেনই বা তুমি অকিঞ্চন জীবগণকে লইয়া এই ব্যাধের খেলা খেলিতেছ? পদে সূত্রবদ্ধ শিক্‌রে পাখী উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া ইতস্ততঃ লম্ফ ঝম্প করত যেমন ক্লান্ত হয় এবং ব্যাধের হস্তেই বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করে, সেইরূপে জীবগণকে কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ করিয়া কেনইবা টানিতেছ ও আনিতেছ এবং বসিয়া মজা দেখিতেছ? ইহার মর্ম্ম যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখ! "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—মানবের আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত পুত্রের নাম "আত্মজ"। এই একটী শাস্ত্রের কথা। ইহাতে কে কার উদরে প্রবেশ

করিল? কে কারে মা বলিল? কার স্তন্য কে পান করিল? ইহার যে কোন হিসাবই পাই না। হে ঈশ্বর! এই গুলি তোমার সংসার-সৃষ্টির লীলা-রহস্য বলিয়া মানিতে হইলে, জিজ্ঞাসা করিব—এইরূপ খিচ্‌ড়িপাকান বন্দোবস্তের প্রতিষ্ঠা করিলে কেন? আত্মজ শব্দের কি অন্যরূপ অর্থ করা যায় না? করিলেই বা কি হইবে? মানব জরায়ুজ অর্থাৎ জীবজ জীব। ইহা ব্যতীত উদ্ভিজ্জ ও অণ্ডজ আদি জীবপুঞ্জ রহিয়াছে। এই বিশাল জীবপ্রবাহ অনন্তকাল হইতে বহিয়া আসিতেছে বুঝা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে এই জীবপুঞ্জের উৎপত্তি হইল? কিরূপেই বা আমাদের প্রথম মাতা-পিতার উদ্ভব হইয়াছিল?—এই গভীর প্রশ্নের উত্তর যে এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না।

পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্প বিস্তর কথাবার্ত্তা দেখা যায়। বেদ, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ঈশ্বরের মুখ হইতে নিঃসৃত বাক্য বলিয়া সকল জাতির বিলক্ষণ অভিমান এবং আস্ফালন জানা যায়। অথচ প্রকৃত ও প্রধান প্রধান বিষয়ে অনেক মতবৈষম্য লক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট-পদার্থ এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সকলের স্রষ্টা এই কথা মানিয়া থাকে। তবে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ ঘটিল কেন?

এই বিষয়ে হিন্দুদের মধ্যেও আবার বেশী গোলযোগ দেখা যায়। ইহাদের মতে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব, মনুকথিত সৃষ্টিপ্রকরণ এবং পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রকরণে বহুতর বৈলক্ষণ্য ও বহু বাগ্‌বিতণ্ডা লক্ষিত হইতেছে। বাইবেলের মতে ঈশ্বর ছয় দিবসের মধ্যেই জল, আকাশ, দিবা, রাত্রি, উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু আদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কার্য্য শেষ করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রামসুখ অনুভব করেন। সপ্তম দিবসের পরে প্রথম-সৃষ্ট-মনুষ্য আদমের নাসিকা-রন্ধ্রে নিশ্বাস প্রয়োগপূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নিজ মায়াশক্তিতে আদমকে নিদ্রাভিভূত করিয়া চুপে চুপে তাহার পঞ্জরাস্থি কাটিয়া তদ্দারা ঈভ্ নামক স্ত্রীরত্নের সৃষ্টি করেন।

মুসলমানদের সকলই তড়িঘড়ির কার্য্য। ইহাদের মতে চারি দিবসের মধ্যেই ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য শেষ হইয়াছিল। কোরাণ বলেন,—ঈশ্বর আপন জ্যোতির কিয়দংশ লইয়া প্রথমে জল, বায়ু, এবং অগ্নির সৃষ্টি করিলেন। পরে অগ্নি ও জল হইতে ধূম ও ফেনার উৎপাদন করিলেন এবং তাহা হইতে আবার জল, ধূম ও লৌহ আদি ধাতুদ্রব্য এবং নিজ জ্যোতির ক্ষুদ্রাংশ হইতে বুদ্ধি, প্রীতি ও লজ্জা আদি সৃষ্টি করিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে মনুকথিত সৃষ্টিপ্রকরণে দেখিতে পাই,—প্রথমে কেবল ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।

ঈশ্বর প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া অগ্রে জলের সৃষ্টি করেন ও তাহাতে বীজ বপন করেন। উক্ত বীজ এক জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডাকারে পরিণত হয়। এই অণ্ডে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা উক্ত অণ্ডমধ্যে এক বৎসর কাল বাস করিয়া তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন। এক খণ্ড দ্বারা দ্যুলোক ও অপর খণ্ড দিয়া ভূলোক, আকাশ আদি ক্রমে উৎপন্ন করেন।

শ্রুতি বলেন,—পূর্ব্ব-প্রলয়ের পরে কিছুই ছিল না। কেবল এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর ছিলেন। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই এই পরিদৃশ্যমান যত কিছু উৎপন্ন হইল। সর্ব্বপ্রথমে আকাশ উৎপন্ন হয়। পরে আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে তেজ আদি মহাভূত ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী আদি উৎপন্ন হয়, এবং ক্রমে ক্রমে বহুকাল ধরিয়া চেতন অচেতন পদার্থের সূক্ষ্ম বীজ হইতে জীব ও জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা উঠিতেছে,—আমরা কোন্ মতটী সঙ্গত বা আত্ম-প্রত্যয়ের অবিরোধী বলিয়া মানিব? বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া বোধ হয় না কি?

কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন,—জড় জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে জীব-জগতের উৎপত্তি এবং নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমেই উৎকৃষ্ট জীবের

উৎপত্তি অসম্ভব নহে। কোন কোন সাহেব সিম্পাঞ্জি শ্রেণীর বনমানুষ ও বানরকে আমাদের আদিম পিতৃপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বহু চিন্তা করিয়া মশকের উদরাভ্যন্তরে যাবতীয় ম্যালেরিয়ার বীজের আবিষ্কার করিয়াছেন। এখন কেবল "ধা-রে মশা ধা" বলিয়া মশাগুলিকে পৃথিবী হইতে তাড়াইতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে প্লেগরোগের বীজ বা কারণ আবিষ্কারবিষয়ে গভীর গবেষণা চলিতেছে। ইহাতে হংকং, বোম্বে, করাচি এবং প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশের জীবমাত্রেই তটস্থ হইয়া পড়িয়াছে; কোন্ দিন কোন্ জানোয়ার ধরা পড়ে ঠিকানা নাই।

এই সকল সংশয়াত্মক খেদোক্তি জনান্তিকে বলিতে-ছিলাম, এই সময়ে প্রেমানন্দ তর্কবাগীশ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কেহে তুমি অসঙ্গত প্রলাপ বকিতেছ? যাহা ইচ্ছা বলিতে নিষেধ করি না—কিন্তু শাস্ত্রসকলের অকর্ম্মণ্যতা ও ঈশ্বরের নিয়ম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্তটা আপাততঃ স্থগিত রাখিলে ভাল হয়। তোমার যে যে প্রশ্ন আছে ও শাস্ত্রের যে যে স্থানে সংশয় আছে, তাহা ধীরভাবে বলিলে, আমি ক্রমে ক্রমে তাহার উত্তর দিতে পারি।"

আমি তখন বিনীতবচনে বলিলাম,—মহাশয়! ক্ষীণবুদ্ধি আমি, যে সকল প্রলাপ বকিয়াছি, তাহা ভ্রান্তি-বশতই বলিয়াছি, জানিবেন। চিত্তের ভুলই সকল গোলমালের মূল। এক্ষণে ত্রুটি মার্জ্জনা ও যথোচিত উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

তর্কবাগীশ। তোমার প্রশ্নভঙ্গীতে নিজের বুদ্ধিদৈন্য ও সংশয়সূচক মনের মালিন্যই বুঝা যাইতেছে। এই সংশয়সকলের অপনোদন হইলেই শাস্ত্রকারগণ ও ঈশ্বরের নিয়মাবলীর প্রতি দোষারোপ করিবার অবকাশই থাকিবে না। আমাদের দেশের পুরাতন ঋষিরা জগৎ-সৃষ্টি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা আদি সম্বন্ধে যোগবলে, ধ্যান-বলে ও জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব তত্ত্বে উপনীত হইয়া লোক-হিতার্থে যে সকল রত্নরাজি সূত্রবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতেরা তাহার ভাষ্য আদি করিয়া উপনিষৎ, ষড়্দর্শন, গীতা ও পুরাণাদিরূপে জ্ঞানের অক্ষয্য ভাণ্ডার বিস্তার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এ সকল স্বত্ত্বে আমাদের কিসের অভাব? ও কিসের চিন্তা? বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা কোন অংশে আমরা দরিদ্র নহি।

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যে সময়ে কেবল জ্ঞানরূপ দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই অপূর্ব্ব তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, তখন তোমার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক,

পাশ্চাত্য জাতিরই জন্ম হইয়াছিল কি না সন্দেহ। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধূমধাম দেখিয়াও বিস্মিত হইবার প্রয়োজন নাই। অদ্যাপি বহির্জগৎ সম্বন্ধে যত কিছু ধূমধাম চলিতেছে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে উহাদের গবেষণা এখনও সুদূরে রহিয়াছে এই কথাই বলিব।

যাহা হউক, এখন আমাদের এ সকল চর্চ্চার প্রয়োজন নাই। তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। দেখিতেছি তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছ এবং এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রেরও উল্লেখ করিতেছ, তবে তোমার এত নির্বেদ-বুদ্ধি ও ভয় কেন?

রামাক্ষয়। মহাশয়! আমার আভিজাত্য বা শাস্ত্র-জ্ঞানবিষয়ে কিছুমাত্র অভিমান নাই। আমার মত লোকের এই প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান বিড়ম্বনামাত্র। অথবা আমাকে একটী চিনির বলদ বলিয়া জ্ঞান করুন। ঘোর অন্ধকারেও হস্তপদাদির পরামর্শ মতে চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু নিবিড় অন্ধকার মধ্যে সামান্য আলোক পদে পদে পদস্খলনের কারণ হয়। আমার পক্ষে ইহাই ঘটিয়াছে। আর চিত্তের ভ্রান্তি ভয়ের কারণ জানিবেন।

তর্কবাগীশ। যখন তোমার কোন বিষয়ে আত্মাভি-মান নাই দেখিতেছি, তখন তুমি জ্ঞানলাভে প্রকৃত অধিকারী। এক্ষণে আইস, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

এই সম্বন্ধে উপরিভাগে শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া তুমি স্বয়ং সর্ব্বশেষে যে শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছ, তাহাই প্রায় উপনিষদাদি-শাস্ত্র-সম্মত ; কেবল তোমার প্রশ্নভঙ্গীতে কতকাংশ রূপান্তরিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্মবন্ধন, পরলোক ও জন্মান্তর আছে এবং কর্ম্মফলের আবশ্যকতা আছে সত্য ; তবে তুমি পরলোকে যে প্রণালীতে কর্ম্মফলের হিসাব নিকাস দিবার আশঙ্কা করিতেছ, সে আশঙ্কা নাই। তোমার স্বকল্পিত প্রণালীমতে হিসাব নিকাস লইতে হইলে ঈশ্বরকে কোটি কোটি দিগ্গজ হিসাবকুশল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়, এবং যে প্রণালীতে জগতে জীবসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্দৃষ্টে সময়ে সময়ে সরঞ্জামি খরচার বিপুল আয়োজন করিতে হয়। লৌকিক কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে বিধাতার অটল ও অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মাবলীর অনুমান করিওনা। এই জটিল বিষয়গুলির সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে কয়েক কথা বলিব। আপাততঃ আত্মা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দেহতত্ত্ব, এবং জন্মান্তরবাদ আদি সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিতে চাই। সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংযোগ, বিশ্লেষণ, আদি কতকগুলি শাস্ত্রের পরিভাষা, ঈশ্বরের মায়াশক্তি, সত্ব, রজঃ, তম আদি কতকগুলি কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় তোমায় বেশী বলিতে হইবে না। আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য-স্বভাব, এক অপূর্ব্ব জিনিস, কেবল আত্মপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। "আমি সুখী, আমি অসুস্থ" ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারা আত্মার উপলব্ধি হয়। ইহাতে অন্য প্রমাণ চলে না। বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আদি আত্মার গুণ। দেহ আত্মা নহে, মন আত্মা নহে, এবং মন বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানসমষ্টি আত্মা নহে। এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ আছে, এ সকলের অতিরিক্ত বুদ্ধ্যাদি-গুণযুক্ত আত্মা বিভু ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। আত্মার আত্মা পরমাত্মা। এ পর্য্যন্ত এই পরমাত্মার বা পরম পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সহজে বুঝাইবার উপায় করা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে,—এখানে মনের ও বাক্যের গতি-প্রসর নাই। ঋষিগণ যখন যোগবলে দেখিলেন,—পরিচ্ছিন্ন-মতি মানব, সোজা পথে গিয়া এই অপরিচ্ছিন্ন-মহিম অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য, তখনও নিরস্ত না হইয়া উল্টা পথে চলিতে চলিতে বলিয়া উঠিলেন,—"অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং" [বৃ, আ] "ইহা নহে, ইহা নহে"—এইরূপেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ; ইহা অপেক্ষা তাঁহার অন্য উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশ নাই। এইরূপে ঋষিগণ ধ্যানযোগে যতই ঈশ্বরকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু,

প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে থাকিলেন,—ইহলোকে পরিমিত পদার্থ মধ্যে কিছুই ঈশ্বর-নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নাই। তলবকার ঋষি অভ্রান্ত বচনে বলিলেন ;—

"যৎ বাচা নাভ্যুদিতম্, যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং তদেব বিদ্ধি ব্রহ্ম ত্বং নেদং যদিদমুপাসতে," —"বাক্য যাঁহার বর্ণনা করিতে পারে না, যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রেরিত হইয়া থাকে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। মনেরও মন যাঁহার মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক প্রবাহ জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা ঈশ্বর নহে," এইরূপে পুরাতন ঋষিরা পরব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মই আমাদের যাহা কিছু সকলেরই মূল কারণ, এই সৎ একমাত্র পরব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে পারিলে, সকলই জানা যায়।

রামাক্ষয়। মহাশয়! যাহা বলিলেন, তাহাতে ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিবার কোন আশাই দেখিতেছি না। চিরবাঞ্ছিত বস্তুতে এ পর্য্যন্ত বঞ্চিত রহিয়াছি। বোধ হয় এ জন্ম এই ভাবেই কাটিল। তিনি যখন যোগবলেও

দুরধিগম্য, তখন বেদ ও শ্রুতিতে তাঁহার যে গুণগান রহিয়াছে, তৎসমুদয় শ্রবণ ও মনন ব্যতীত অন্যরূপে তাঁহাকে জানিবার উপায় দেখিতেছি না। পেটে ক্ষুধা থাকিতে কেবল ভাবের গীতেই বা তৃপ্তি হয় কৈ ? তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানী এই শব্দগুলি স্বপ্নে মেওয়া খাওয়ার মত অলীক পদার্থ দাঁড়াইল না কি ?

তর্কবাগীশ। তোমায় এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটী মোটামুটি কথা বলিতেছি। লোচনের সকল কার্য্য বচনে সম্পন্ন হয় না। লোচনের কার্য্য আবার আলোক-সাপেক্ষ। ঘোর অন্ধকারে সূর্য্যকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে সূর্য্যেরই আলোকের প্রয়োজন হয় কি না ? তুমি শরীরী, জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যের যে একটী মূর্ত্তি আছে, তাহারই প্রভাবলে ঐ মূর্ত্তি তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল এবং তুমি সূর্য্যরূপ পদার্থের অবধারণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলে। কিন্তু পরমাত্মা নির্গুণ, নিরবয়ব, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দ ও সুখস্বরূপ, বাক্য ও মনের অগোচর; কেবল আত্মসম্বিদ্-সম্বেদ্য। এইরূপ সম্বিদ্ বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান-জিজ্ঞাসু সাংসারিকের অনন্ত জীবনের অনন্ত আধ্যাত্মিক চিন্তার ফল জানিবে। কাজেই আমাদের পক্ষে তিনি অগাধ জলের নিধি। সর্ব্বাধারে অবস্থিতি করিলেও জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর বলিয়া তাঁরে খুঁজিতে হইলে আমাদিগকেও অগাধ জলে

ডুবিতে হইবে; কিন্তু মন ত সহজে ডুবে না; টোপা পানার মত ভাসিয়া বেড়ায়। মন আবার ত্রিগুণাত্মক। পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত। তোমার ও আমার আত্মা—জীবাত্মা-ত্রিগুণময়। এই জীবাত্মা যখন প্রাণের প্রাণ-সহিত সংযুক্ত হইয়া মনকে অন্তরচারী করিয়া অগাধ তলে ফেলিয়া চিন্তায় মগ্ন হইতে সমর্থ হয়, তখনই সেই পরমাত্মার সচ্চিদানন্দরূপ অবধারণ করিতে পারে। তখন তাহার চিন্তালব্ধ সান্দ্রানন্দ তোমার স্বপ্নলব্ধ মেওয়া অপেক্ষা যে কতই সুমধুর, তাহা অনুভবকারীর আত্মাই বুঝিতে পারেন। জ্ঞান ও অনুভব বেদ্য বস্তুর মাধুর্য্য কেবল আস্বাদনযোগ্য, অন্যরূপে বুঝিবার যোগ্য নহে এবং বুঝাইবার ত কথাই নাই। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ ও স্বরূপপ্রাপ্তি জীবের পরম উদ্দেশ্য; উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য ও পরস্পর অব্যবহিত; তথাপি জীবাত্মার এই উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হইবার নহে। ইহা কেবল সেই পরমপুরুষের নিয়মমাহাত্ম্যের প্রভাব। তিনি জীবকে চৈতন্যশক্তি দিয়াছেন, কিন্তু তাদৃশ বোধশক্তি দেন নাই। অথবা জীবের বোধশক্তিকে অবিদ্যারূপ আবরণে অথবা মায়ামেঘে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরদত্ত চৈতন্যালোক আমাদের চিত্তাভ্যন্তরস্থিত চোর-কুঠারির অন্ধকার সম্যক্‌রূপে দূর করিতে পর্য্যাপ্ত নহে। কাজেই বাক্য মনের অগম্য এবং জ্ঞান ও

বিজ্ঞানের দুরধিগম্য কূটস্থ অনন্ত ব্রহ্মের সাধন, সগুণের পক্ষে যখন অসাধ্য, তখন সেই পরমপুরুষের আকার-বিশিষ্ট অংশের ধ্যান ও সাধনাই সার যুক্তি। ইহাই স্বকল্পিত কামনাময় রূপের সাধন অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই নিরবদ্য ও প্রশস্ত। সেই পূর্ণানন্দের আকারবিশিষ্ট অংশ দেখিতে বা মনে মনে ভাবিতে যদি বাসনা রাখ, তবে দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র, বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণ এবং জগন্নাথ-পুত্র নদীয়ার চাঁদ নিমাই বা গৌরাঙ্গকে নির্দ্দেশ করিব। সান্ত মনুষ্য অনন্ত ব্রহ্মকে নরাকারে দেখিতে ও বুঝিতেই সমর্থ। তাঁহার পূর্ণ মূর্ত্তি বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে বা অবধারণ করিতে কখনই সক্ষম হয় না। মানব-মধ্যে কেবল জিষ্ণু অর্জ্জুন একবার ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া-ছিলেন। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনের প্রতি প্রীতিবশতঃ আপন বিশ্বরূপ তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন; তখন অর্জ্জুন মহাদেবের বলে বলীয়ান্, শক্র-শক্তিতে শক্তিমান্ এবং ভগবৎ-শক্তিতে অনুপ্রাণিত, গুণযুক্ত গাণ্ডীবের গরিমায় গরীয়ান্। এ হেন বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ভগবানের অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিতকলেবর এবং ভয়বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং স্তব স্তুতি করিতে করিতে বলিয়া উঠেন,—হে জগন্নিবাস! আমি তোমার এই অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিতে একান্ত অসমর্থ, কাতর ও ভীত হইয়াছি; হে দেবেশ! প্রসন্ন

হও এবং এই বিকট মূর্ত্তি সংহরণ করিয়া তোমার সেই সৌম্য পরিচিত মূর্ত্তি দেখাইয়া সান্ত্বনা কর।

যোগবলে চক্ষুদান পাইয়া যে সকল পুরাণ ঋষিরা সেই সচ্চিদানন্দময়ের স্বরূপচিন্তনে মগ্ন হইয়া আনন্দামৃত পান করিতে করিতে অমৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিলাম এবং নরাকারে অবতীর্ণ সেই পরমপুরুষের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত লোলুপ বীরবর অর্জ্জুনের কথাও বলিলাম; এখন তোমার যে মূর্ত্তি দেখিবার অভিলাষ, তাহাই দেখ। জ্ঞানিগণ জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া নির্গুণ, নিরবয়ব, পরম পুরুষকে দেখিতে পারেন দেখুন, কিন্তু তাহা কাঙ্গালের মহানিধি প্রাপ্তির ন্যায় সাধারণ জনের তাদৃশ কার্য্যকরী হয় না। তাহাদের পক্ষে সগুণ মঙ্গলময়ের নরাকার দর্শন, শ্রবণ,ও মননই অনায়াস-সাধ্য ও সদ্যফলপ্রদ। যিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন এবং যিনি প্রায় আমাদের সমানধর্ম্মা এবং আমাদের সমদুঃখসুখী, তাঁহার পূর্ণা-পূর্ণতা ও মায়াশক্তিবশে সঙ্কীর্ণতা পর্য্যালোচনা না করিয়া তাঁহারই ভজন, সাধন ও বিশ্বজনীন গুণাবলীর অনুকরণই মানবের পক্ষে সুসাধ্য। অপরিচ্ছিন্নমহিম নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত গুণাবলীর অনুকরণ অসম্ভব। সহানুভূতি না হইলে আবার অনুচিকীর্ষাই জন্মে না। সজাতিমধ্যেই সহানুভূতির সমধিক উন্মেষ

দেখা যায়। কাজেই মানবের সহানুভূতি মানবের প্রতি সমধিক রূপে হইয়া থাকে। যখন মানব আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপাসনা ও চরিত্রের অনুকরণ করিতে ব্যগ্র, তখন সর্ব্বগুণাকর জগৎসখা কথিত পুরুষসত্তমদিগের উপাসনা সাধনে কিসের ধোঁকা? এই উপাসনা-সাধনে মানবকে কোন প্রকার কঠোর তপঃক্লেশ বা বিধি অনুসারে আড়ম্বর করিতে হয় না। কেবল বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশ্বাস, অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম, এবং সাধু-সঙ্গই এই সাধনের উপায় জানিবে। ভক্তবৎসল পরম পিতা যখন কোন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, অথবা কোন সাধুকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, তখনও তিনি অকস্মাৎ কোন নরাকার-অঙ্গীকারে আবির্ভূত হইয়া অথবা অন্য উপায়ে প্রেমের পশ্‌রা প্রসারিয়া কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন। অতএব নরাকারে অবতীর্ণ কথিত মহাপুরুষদিগের অসীম স্বার্থত্যাগ, নিষ্কাম ভাব, পবিত্র সৌভ্রাত্রভাব, নির্হেতু প্রীতিভাব, সত্যপরায়ণতা, কর্ম্মাক্লিষ্টতা, ধর্ম্মশীলতা ও পরার্থপরায়ণতা আদি গুণ-গ্রাম স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও। ইহা বীরসেবা বলিতে হয়, বল। বস্তুতঃ এই দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর রূপ পরমপুরুষের সেবাই প্রার্থনীয় ও কায়মনোবাক্যে করণীয়। নরাকারে পরমাত্মার নিত্য সেবা সাধনার্থেই, তাঁহার সৃষ্টির নিয়মবন্ধন, অথবা

আত্মাই পিতা এবং আত্মাই পুত্র এই দুশ্ছেদ্য প্রেম-ডোর বন্ধন বুঝিবে এবং বিচক্ষণ বিপশ্চিদ্‌গণের "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রাংশের যে কিছু ব্যাখ্যা তাহা বিচারসঙ্গত বলিয়াই গ্রহণ করিবে। পিতৃসেবায় আত্মার সেবা, আত্মার সেবায় পরমাত্মার সেবা জানিবে। ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ভাব। এই ভাবের অভাব বশতঃ মোহান্ধ লোক ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া এবং নিজ ঘরে মূলাধারে যে মূল ধন পোতা রহিয়াছে তাহার সন্ধান না করিয়া নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যতদূর দেখা যায় তাহাতে স্থূল রূপের বাহ্য সৌন্দর্য্যেই জগতের অধিকাংশ লোক আত্মহারা; ভিতরের সূক্ষ্মভাব—সারভাব—বুঝে এবং তাহাতে অনুরাগ, ভক্তি ও প্রীতি সহকারে মজে, এইরূপ লোক অতি বিরল। তুমিও দেখিতেছি—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই কথা লইয়া এত গোলমাল উঠাইলে, কিন্তু "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ"—ইত্যাদি মহতী কথাটীর উল্লেখও করিলে না। গোলোকপতি ভগবান্ ভূলোকে নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া এবং দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়া লৌকিক ব্যবহারে যেরূপে স্বার্থবিসর্জ্জন, সর্ব্ব জীবে সমদর্শন এবং কায়মনোবাক্যে পিতৃনিদেশ-পালন, পালক পিতার বাধা অগাধে মস্তকে বহন, জন্ম-দাতা বৃদ্ধ পিতার হস্তে নিজার্জ্জিত সমস্ত সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার

প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিয়া কয়জন লোক কার্য্যানুবর্ত্তী হইতেছে? শ্রী:গৌরাঙ্গের মত কয়জন সচেতন ধর্ম্মবীর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মপথ পরিষ্কার করিয়াছেন, বল দেখি? এই মহাপুরুষে নিয়ত ভাবাবেশ (God-consciousness) লক্ষিত হইত। কথায় কথায় সমাধি-কালে অন্তরের অন্তস্তলে মূলাধারে বাঞ্ছিত বস্তু সন্দর্শন করিয়া ইনি যে কি অপার আনন্দ অনুভব করিতেন তাহা কে বুঝিতে পারে? ইহা কি আত্মায় আত্মায় মিলন? অথবা গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎকারে মহানন্দ-সিন্ধুনীরে কি পূর্ণ জুয়ারের জোর? যাহা হউক, এই অভিনব প্রকার আত্মচিন্তনে একান্ত মগ্ন হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য এবং উন্মত্তপ্রায় হইতেন, তাহাতে সমকালীন লোকেরা তাঁহার "আউ্লে মহাপ্রভু" এই নাম দিয়াছিলেন। তাহা সার্থক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এদিকে আবার তাঁহার মাতৃভক্তি এবং ভক্তানুরক্তি কি রমণীয় ও কিরূপ অভিলষণীয় বল দেখি? বস্তুতঃ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের মত আদর্শ মহাপুরুষ কোথায় পাইবে? ইহাঁদের জীবনলীলায় ভক্ত-ভাব ও ভগবৎ-ভাব নিয়ত অভিব্যক্ত; অথচ ইহাঁরা নিত্য সত্য বস্তু। মর্ত্ত্য ধর্ম্মবশে ইহাঁরা বহুদিন হইল নিজ নিজ স্থূল দেহ রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এখনও যে উহাঁরা বিরাজ করিতেছেন না অথবা

আমাদের মধ্যে অগোচরে থাকিয়া পূর্ব্বের মত জগতের মঙ্গলকার্য্য ও জীবরক্ষা, করিতেছেন না এবং পদে পদে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন না, ইহাই বা কিরূপে বলিব? এই নিত্য সত্য বস্তুর অনুসন্ধিৎসু মানবমধ্যে নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, ও কৃপাসিদ্ধ এই তিন শ্রেণীর লোকের কথা শুনিতে পাই। ইহার মধ্যে জ্ঞানী নিত্য-সিদ্ধ লোক অতি বিরল। আজ কাল বেদবিধি অনুসারে সাধন-সিদ্ধিও ততটা সুসাধ্য নহে। কাজেই জ্ঞানহীন ও সাধনবিহীন মানবের কৃপাপথ ব্যতিরেকে অন্য পন্থা নাই এবং অন্য দাবী দাওয়া নাই। তাহার পক্ষে ভক্তি-পন্থা অবলম্বন করিয়া ভক্তবৎসলের কৃপালাভের নিমিত্তই কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ এই ভক্তি-পন্থাই অতি সহজ। দয়াল গৌর এই পথের নেতা ও কৃপাদাতা। বিশুদ্ধ চিত্ত, অনুরাগ ও ভক্তিমাত্র সম্বল অবলম্বনে এই পথের পথিক হও; তাঁহার কৃপা-লাভে কদাচ বিফলযত্ন হইবে না। অল্প দিবস মধ্যে বুঝিতে পারিবে, তোমার মনের আঁধার দূর হইতেছে, অদান্ত মন শান্ত ও সংযত হইতেছে, স্বভাব ক্রমশঃ সরল ও মধুর হইয়া আসিতেছে, হৃৎপদ্ম বিকসিত ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেছে এবং ভবের ভাবনা কমিতেছে। "চিত্তং সত্যেন শুধ্যতি"—সর্ব্ববিষয়ে কায়-মনোবাক্যে সত্য অবলম্বন করিলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া

থাকে এবং শুদ্ধ চিত্তেই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্‌ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তপঃসাধনও সত্যের সমান নহে জানিবে।

তোমার প্রশ্ন-মধ্যে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই সৃষ্টিপ্রকরণ লইয়া নানা মুনির নানা মত সত্য, কিন্তু এই বিবিধ মতের অবতারণা করিয়া গোলমাল তুলিবার প্রয়োজন দেখি না। এই সম্বন্ধে ঋক্ বেদ, শ্রুতি, উপনিষৎ, গীতা আদিতে ঋষিপ্রবর প্রজাপতি ও অরুণি প্রভৃতি যে অপূর্ব্ব তত্ত্বের নির্ণয় ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহাঁদের মতে পূর্ব্ব প্রলয়ের পরে কিছুই ছিল না। এই ভূলোক, দ্যুলোক, জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রমালা-মণ্ডিত আকাশমণ্ডল আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু ছিল না। অসৎও ছিল না; একটী পরমাণু ছিল না; এক ফোঁটা জলও ছিল না, এবং অন্ধকারও ছিল না; কেবল এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাশূন্য-সমুদ্রে বিরাজ করিতেছিলেন।

"সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয় ইতি"—সেই এক ব্রহ্ম-চৈতন্য প্রজা সৃষ্টি করিয়া বহু হইবার কামনা করিলেন এবং সিসৃক্ষু ব্রহ্ম-চৈতন্যের কামনা অনুসারে তাঁহার প্রেমার্দ্র মনের বীর্য্যধারা বা প্রেম-তরঙ্গ যেমন ছুটিতে লাগিল, অমনি তাঁহার মহাশক্তি-মাহাত্ম্যে এই বিচিত্র বিশ্ব ক্রমে প্রকটিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমেই

আকাশের সৃষ্টি হয়। পরে আকাশময় ব্রহ্ম হইতে বায়ু এবং বায়ুগত ব্রহ্ম হইতে তেজ। পরে তেজোময় ব্রহ্ম হইতে জল, পৃথিবী আদি ভূতগ্রাম বা সাবয়ব মৌলিক পদার্থসকলের উদ্ভব হইতে লাগিল।

ক্রমে এই সাবয়ব জল ও পৃথিবীর অন্তর্গত ব্রহ্মের বহুভবন-ইচ্ছা বা বহু হইবার কামনা অনুসারে ক্রমে অন্ন, প্রাণ, মন আদি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন জীবগণ উৎপন্ন হইতে থাকিল। এই প্রণালীতে আবার অচেতন মহাভূতের উদ্ভব জানিবে। এই জীব ও জড় জগৎ সকলই সৃষ্ট পদার্থ এবং এক চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মাই সকলের স্রষ্টা ও মূল কারণ। এই চেতনাত্মা ব্যতীত কোন পদার্থের সত্তা নাই ও কখনও ছিল না। এই চেতন পরব্রহ্মের মহাশক্তি—পরাশক্তি ও চেতনাময়ী এবং ক্রিয়াশীলা। তিনি সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় অচেতন নহেন এবং এই সদাত্মক জগৎ অসদাত্মক কোন অসৎ হইতে উৎপন্ন হইবার নহে ও তাহা কখনই হয় নাই। এই নির্ণীত তত্ত্ব স্বীকার করিলে মতদ্বৈধ বা মতদ্বন্দ্ব থাকে না। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদেরাও একটী আদি শক্তি স্বীকার করিতেছেন এবং সেই আদি শক্তির বিবর্ত্তনে এই জড় ও জীব জগতের বিকাশ হওয়া মানিতেছেন। বৈলক্ষণ্য এই—তাঁহারা এই আদি শক্তি মৌলিক কারণ-সমষ্টিনিষ্ঠ বলিয়া

থাকেন এবং বেদমতাবলম্বী মুনি ঋষিরা এই আদ্যা-শক্তি সর্জ্জনোন্মুখ ঈশ্বরেরই মহতী মায়াশক্তি বলিয়া নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের বিভুতা, সর্ব্বাত্মতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিলে এই সিদ্ধান্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে মায়া-উপাধি-গ্রস্ত নিরবয়ব আত্মা হইতে সাবয়ব পদার্থের সমুদ্ভব, বৈষম্যের ভিতরে সাম্য এবং বৈচিত্রের ভিতরে সহজ ভাবের সম্ভাব বিস্ময়জনক বোধ হইবে না।

তোমার উল্লিখিত মতান্তরে চারি দিন বা সাত দিন মধ্যে ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি-কার্য্য শেষ হওয়া সিদ্ধান্তটী আমাদের অবলম্বিত বেদাদিমতবিরুদ্ধ এবং আত্ম-প্রত্যয়-বিরুদ্ধ বলিব। সৃষ্টিকার্য্য ঈশ্বরের কামনা-সম্ভূত। তিনি কবি বা রচনা-কুশল; তিনি মনীষী বা মানসিক বীর্য্যবান্ ও পরিজ্ঞাতা; তিনি ত্রিকালজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ অথবা সময় বুঝিয়া ও স্মরণ করিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী। কামনা (Meditation) অনুসারে প্রথমে তাঁহার মনের বীর্য্য বা প্রেমের আবির্ভাব। পরে, দেশ, কাল ও বস্তুর যথাযথ ভাব আদি বিষয়ক জ্ঞানের পর্য্যালোচনা; পরে পদার্থের সমুদ্ভব। উপনিষদাদিতে "শাশ্বতী-সমা" —অর্থাৎ বহু বৎসর ধরিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্য্য করিয়া-ছিলেন প্রকাশ। ইহাই আত্মপ্রত্যয়সম্মত। মহা-ভূত আদির সৃষ্টির পরে তাহাদের স্থিরভাব ও কার্য্য-

প্রণালী এবং এই সৃষ্ট পৃথিবী জীবের বসতিযোগ্য হইল কিনা ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিতে ঈশ্বরকে অবশ্য কাল প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। পরে বিবিধ জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি জগৎভাণ্ডার সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এই কারণেই দেশভেদে কালভেদে ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ে অপার শক্তিমাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদে ঋষিপ্রবর অরুণি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে এই সৃষ্টির তত্ত্ব সবিস্তর রূপে বুঝাইয়াছিলেন। রাত্রিকালে অব্যক্ত পদার্থ সকল, দিবাগমে যেমন ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ প্রলয়-রূপ রাত্রিকালে যত কিছু পদার্থ অনন্তব্রহ্মে লীন হইয়া সূক্ষ্ম বীজাকারে অবস্থিত ছিল, তৎসমুদায় চেতনাময়ের কামনা ও স্মরণ অনুসারে নাম ও উপাধিরূপে অভিব্যক্ত হইল মাত্র। কেহ কেহ এই প্রণালীকে বিবর্ত্তবাদ (Process of evolution) নাম দিয়া থাকেন। যে নাম দেও না কেন, সেই প্রেমময় অনন্ত ব্রহ্মই সকলের মূল। এই মূলের রসেই ফুলে মধু ও ফলে মধুরতা। মূলের রস সদাই চলে, অগোচরে অন্তঃশীলে। ইহা ক্রিয়াশীলা মূলপ্রকৃতির লীলামাহাত্ম্য। জল শুকাইলে কমল শুকায় বটে, কিন্তু মূল যেমন কাদায় মিশিয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জগতের মূলস্বরূপ পরব্রহ্ম আদ্যন্ত-শূন্য ও প্রলয়েও অক্ষুণ্ণ। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্ম ভাব।

তোমার আত্মচিন্তনের প্রথম ভাগেই "মায়াশক্তি ও কর্ম্ম-সূত্র-বন্ধন" ইত্যাদি কয়েকটী কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহার গভীর অর্থ ও প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া উহা বলিয়াছ কি না জানি না। যাহা হউক, এই মায়াশক্তি-মূলপ্রকৃতি বা ব্রাহ্মী শক্তি—অথবা মহা-বৈষ্ণবী শক্তির লীলাতেই এই জড়-জীবময় সমুদয় জগৎ বিকশিত, এক অভেদ্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ ও সম্যক্ রূপে পরিচালিত হইতেছে জানিবে। এই মহাশক্তির অসীম মাহাত্ম্য ভগবান্ মহাদেব অনেক সাধনা করিয়াও পর্য্যাপ্তরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তবে আমাদের বক্তব্য বিষয়ে এই মহাশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছি—ইনি নিষ্ক্রিয় হইয়া ব্রহ্মে নিয়ত বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকার্য্যসময়ে সেই বিশ্রাম-সুখ ত্যাগ করিয়া অথবা একটী মহাত্যাগ স্বীকার করিয়া ইনি কর্ম্মশীল হয়েন; জড় ও জীবগণের পালন ও রক্ষণে মাতৃবৎ যত্ন করেন; এবং নিজের কর্ম্মকরণশক্তি প্রদান করিয়া নিয়ন্ত্রীরূপে জড় ও জীবগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়ত নিযোজিত করেন। এই মহাশক্তির নিয়মবলেই জড় ও জীব জগতে স্বার্থ-কর্ম্ম-সঙ্গে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্তি; আপেক্ষিক কর্ম্মসূত্রে বন্ধন জন্য পরস্পর সহানুভূতি ও লোকস্থিতি জানিবে। ইঁহারই মহানিয়ম-মাহাত্ম্যে জড় ও জীব জগৎ নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়া

পরস্পরের পোষণ ও রক্ষণ করিতেছে এবং কেহ কেহ পরার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছে। ধান্য, কদলী আদি গাছগুলি জীবের ভোগ্য ফলাদি অন্ন দান করিয়া দেহত্যাগ করিয়া থাকে এবং কালক্রমে জীবও নিজ দৈহিক পরমাণুসমষ্টি দ্বারা জড় জগতের পুষ্টিসাধন করে। এই আদান প্রদানরূপ কর্ম্মবৃত্তির প্রকৃত মর্ম্ম যতদিন অবধারণ করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত, মনুষ্য আত্মপর-জ্ঞানজন্য আপন ক্ষতিবৃদ্ধি বুঝিতে এবং ত্যাগস্বীকার-জন্য অসীম সুখ কদাচ অনুভব করিতে পারিবে না। এই আত্মপরজ্ঞানবশেই মনুষ্যের স্বার্থপরতা, বোধশক্তির সঙ্কীর্ণতা ও সমাজবন্ধনের শিথিলতা জানিবে।

দেহ এবং উহার পরিণাম লইয়া তোমার নানা সন্দেহ ও নানা প্রশ্ন। এই সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিব।

দেহশব্দে অবয়ববিশিষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু বুঝায়। সকল বস্তুর বাহির ও ভিতর অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা জড় ও চেতন, দুইটী দিক্ আছে। ব্রীহি যবাদির বাহ্য কোষের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম বীজ আছে, তাহার চেতন-শক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ আদি ভূতসংযোগে যথাসময়ে তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। বালুকণাসদৃশ এক একটী সূক্ষ্ম বীজ হইতে বহুশাখাপ্রশাখাযুক্ত বটাশ্বত্থ আদি বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। জীবজগতেও এইরূপ নিয়ম। এখানেও অতি

সূক্ষ্ম সৎ পদার্থ হইতেই বিবিধ নামরূপধারী জরায়ুজ আদি জীব এবং জীবশ্রেষ্ঠ মানবের উদ্ভব জানিবে।

মানবদেহ সৃষ্টিকার্য্যের এক পরম কৌশল। ইহার আরম্ভ রচনা অতি মহৎ এবং অতি অদ্ভুত। মানবদেহ প্রধানতঃ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং চেতন আত্মা—এই তিনটী পদার্থের সমষ্টি। স্থূলদেহ বা স্থূল শরীর শুক্র-শোণিতের পরিণামবিশেষে এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূত-সঙ্ঘাতে সমুৎপন্ন। ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা—এই ছয়টী কোষ বা অদ্ভুত আবরণ থাকায় ইহা ষাট্‌কৌষিক দেহ নামে অভিহিত। এইরূপ দৃঢ় ভিত্তি ও দুরতিক্রম্য আগারাদি সমন্বিত হইলেও মানবের স্থূলদেহ অনিত্য, নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মানবের এই স্থূলদেহ জীবাত্মার একটী জঙ্গম কারাগৃহমাত্র। এই কারাগারের বাহিরের চাবিকাটি মৃত্যু নামক ভীষণ দ্বারপালের হস্তে সমর্পিত থাকিলেও আত্মার যথেচ্ছরূপে যাতায়াতের বাধা হয় না। তিনি নিদ্রাবেশে অবসন্ন দেহপিঞ্জর হইতে চুপে চুপে বহির্গত হয়েন, এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পরি-ভ্রমণ করিয়া যথাকালে অগোচরে আবার প্রবেশ করিয়া থাকেন, কেবল শেষ বহির্গমনসময়ে প্রকাশ্যভাবে দ্বার-পাল দ্বারা চাবি খুলাইয়া সরিয়া যান। এই স্থূল-দেহের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মদেহ অবস্থিত আছে, তাহা

সপ্তদশ অবয়বে গঠিত, অর্থাৎ প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব। এই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম লিঙ্গশরীর।

এই লিঙ্গশরীর, বিভিন্নবৃত্তিক ইন্দ্রিয়সমষ্টি, মন এবং বুদ্ধি চেতনাত্মক বলিয়া অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়। এই সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট স্থূল শরীর আত্মারই ভোগসাধন। আত্ম-চৈতন্য এই শরীরে অবস্থান করত জীবরূপে অভি-হিত হয়েন এবং বৈষয়িক সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। বস্তুতঃ আত্মা অশরীরী ও অবিনাশী—

"অবিনাশী বা অরে আত্মা"

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"

"নাহয়ং হন্তি ন হন্যতে।" ইত্যাদি।

শ্রুতি দ্বারা আত্মা কখনও কাহাকেও মারেন না এবং নিজেও মরেন না এবং তিনি অজর ও অমর—ইহা প্রমাণিত অথচ এই সকল অবয়ববিশিষ্ট মানব মরণ-ধর্ম্মবান্। তবে মরে কে? এবং কেবা জন্মান্তর পরি-গ্রহ করে? এবং জন্মমরণ শব্দের অর্থই বা কি? এই সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিব।

শাস্ত্রে অবয়বীর ধ্বংস স্বীকৃত ও প্রমাণিত। অবয়ব-সকলের অপূর্ব্ব সংযোগের নাম জন্ম, এবং বিয়োগ-

বিশেষের নাম মরণ। এই নিয়ম ঘটাদি নির্জীব ও মনুষ্য আদি সজীব এই উভয়ই প্রকার পদার্থেই খাটিয়া থাকে। অবয়ব সকলের অপূর্ব্ব সংযোগে উৎপত্তি বা জন্ম এবং অবয়ব সকলের বিয়োগ বিশেষে বিনাশ বা মরণ। সুতরাং স্থূলদেহে প্রাণসংযোগের ধ্বংসই মরণ। মরণে দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদমাত্র ঘটে। যেমন ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ অখণ্ডিত থাকে, সেইরূপ স্থূলদেহে প্রাণসংযোগের বিরতি বা বিনাশে দেহী আত্মা অক্ষুণ্ণ থাকেন।

ইহাতে পরিদৃশ্যমান এই সাবয়ব স্থূলদেহেরই মরণ; ইহাই বুঝিবে। প্রাণশব্দে সূক্ষ্মশরীর-সমষ্ট্যুপহিত চৈতন্য অথবা দেহস্থিত বিভিন্নবৃত্তিশালী পঞ্চ বায়ু বুঝায়। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পাঁচ প্রকার বায়ু এবং ইন্দ্রিয়গণের বিভিন্নবৃত্তিতেই আমাদের জীবন ধারণ হয়। এই নিমিত্ত প্রাণশব্দ নিত্যবহুবচনান্ত। অর্থাৎ প্রাণসকল এই প্রকার প্রয়োগ হয়। মুখ, নাসিকা আদি "প্রাণালয়" অর্থাৎ প্রাণ আদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থান-ভূমি। মৃত্যুকালে শরীরের বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী বায়ু-সকলের বৃত্তি বিরত হইতে আরম্ভ হইলে অথবা বায়ুসকল স্ব-স্ব-স্থান-পরিচ্যুত হইতে থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে থাকে এবং প্রাণসকল ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া উৎক্রান্ত হয়। প্রাণবিগমে স্থূলদেহ বিবর্ণ ও বিকৃত

হইয়া এইখানেই পড়িয়া থাকে এবং ইহার দহন প্রভৃতি অন্ত্যকৃত্য জীবিতেরা আপন হিতার্থেই করিয়া থাকে। দাহই কর বা সড়িয়া পচিয়া যাউক, এখানেও কেবল আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ব্যাপারমাত্র। সামান্য চিন্তায় বুঝা যায়, এখানে দেহগত কোন একটী পরমাণুর ধ্বংস বা বিনাশ হইতেছে না। তবে কালক্রমে অল্পে অল্পে সড়িয়া পচিয়া বিশ্লিষ্ট হওয়া অপেক্ষা অগ্নি-সংযোগে দেহগত ক্ষিতি, জল, আকাশাদি জড়াংশের বিশ্লেষণকার্য্য শীঘ্র সাধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অগ্নি-সংযোগে দেহগত পরমাণুসমষ্টির সত্বর পৃথক্ ভাবে যেমন প্রকৃতির সহায়তা করা হয়, তেমনি জীবিতদেরও বিশিষ্ট উপকার সাধিত হয়। পরলোকের অস্তিত্ববিষয়ে বিশ্বাস যত দৃঢ়তর হইতে লাগিল, আর্য্য ঋষিরা তত অগ্নিসংযোগে মৃতদেহ দাহ করার উপযোগিতা বুঝিতে থাকিলেন।

তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণ বিয়োগের পরে প্রাণময় কোষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেতের অন্নময় কোষের সত্বর ধ্বংস হওয়া সমুচিত। এই নিমিত্ত ঋষিরা সর্ব্বপ্রথমে ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলে চতুর্দ্দশ সূক্তে অগ্নিতে মৃতদেহ নিক্ষেপ করিবার বিধি নিবদ্ধ করেন। ঋক্ বেদ পৃথিবীর প্রথম পুস্তক। আর্য্য ঋষিরাই প্রথমে অগ্নি-দাহের উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন এবং মৃতদেহ অগ্নিতে

নিক্ষেপ করিবার সময়ে প্রেত আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"অপেত, বীত, বিচ, সর্প, তাত" "প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভির্যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ" ইত্যাদি।—(যাও যাও, অপসৃত হও, যে পথে যে স্থানে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃলোক গমন করিয়াছেন, সেই পথে সেই স্থানে গমন কর।)

ইহার পরেই প্রেতকৃত্য অর্থাৎ পিণ্ডদান, সপিণ্ডনাদি শ্রাদ্ধ করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহাতে প্রেতের ভোগদেহ ও আতিবাহিক দেহভোগ সময়ে তাহার ভাবী স্থূলদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সত্বরে পূরণ হইবে, অথবা পিতৃলোক আদি প্রাপ্তির পন্থা পরিষ্কৃত হইবে, এই উদ্দেশে আর্য্যদিগের অন্নময় কোষ সহ প্রাণময় কোষের শীঘ্র ধ্বংস সম্পাদনে যত্ন বুঝা যায়। মন্ত্রশক্তির অপূর্ব্বপ্রভাব মানিলে শ্রদ্ধাবান্ লোকের এই শ্রাদ্ধসকল বিধিপূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আর্য্যদের প্রতিষ্ঠিত অগ্নিসংযোগে মৃতদেহ ভস্মসাৎ করার প্রথা প্রশস্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন এবং আজকাল অনেক বিচক্ষণ সাহেবও নিজ দেহ অগ্নিতে দাহ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ ও বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন।

যে পরমাণুসমষ্টির অপূর্ব্বসংযোগবশে এই দেহবন্ধ এত সৌন্দর্য্য ও মাৎসর্য্যের আধার ও এত যত্ন ও আদরের

সামগ্রী ছিল, সেই পরমাণুসমষ্টির পৃথক্ ভাবে এইরূপ অপ্রীতিকর পরিণাম!!! এখন এই হীনবেশে কোন্ দূরদেশে যাইতেছ ইহা অনিত্যে নিত্যাভিমানীদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। যাহা হউক, এই পরিণতিতে কদাচ বিস্মিত হইবে না। ইহা অবস্থান্তরমাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন ও নবীভাব নিয়ত চক্রবৎ ঘুরিতেছে।

মরণের অপর নাম "মোহ বা অত্যন্ত বিস্মৃতি"। মরণসময়ে জীব প্রায় উৎকট যাতনায় অভিভূত হইয়া থাকে। পরে আবার যখন ষাট্‌কৌষিক দেহ পাইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন অন্ধজরায়ু মধ্যে কিছুকাল অবস্থান করিতে হয়। কাজেই উহার পূর্ব্ব মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত ও অভিনব মস্তিষ্ক সংজাত হয়। এই সকল গুরুতর পরিবর্ত্তনবশতঃ পূর্ব্বাভ্যস্ত ও পূর্ব্বানুভূত বিষয় একবারে ভুলিয়া যাওয়া এবং নিজের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে না পারা জীবের পক্ষে বিচিত্র নহে। পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হউক বা না হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্মফলের সংস্কার একবারে বিলুপ্ত হয় না, একথা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

মরণের পরে আমাদের শাস্ত্রে "প্রেত্যভাব" অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম আছে এবং এই মতের সমর্থন বিষয়ে অকাট্য প্রমাণপরম্পরাও রহিয়াছে। জীবের অপবর্গ বা মুক্তি-

ভোগসাধন শরীর লাভও সকলের ভাগ্যে ঘটে না। স্থূলদেহ ত্যাগের পরেই জীব কিছুকাল ত অজ্ঞানে অভি-ভূত অথবা দীর্ঘনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে তাহার সুখদুঃখসহিষ্ণু একটী ভোগদেহ উৎপন্ন হয়। মনু বলেন, এই ভোগদেহ জরায়ুজাদি-দেহ-ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ উহা শুক্রশোণিত-সঞ্জাত নহে। এই সম্বন্ধে বিচারের গোল না তুলিয়া অন্যান্য শাস্ত্রের সমালোচনার ফলসিদ্ধান্তটাই একবারে তোমায় বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হইলে তাহা সংজ্ঞা বা চেতনা শূন্য হয়। দেহ হইতে আত্মার বহির্গমন প্রতিদিনই ঘটিয়া থাকে। এইরূপে অগোচরে আত্মার বহির্গমন একটী অতি অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইবার কথা। কিন্তু ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার বলিয়া ইহাতে লোকের তাদৃশ বিস্ময় জন্মে না এবং আত্মার নিত্য বহির্গমন এবং শেষ প্রয়াণের মধ্যে বৈলক্ষণ্য অথবা সংজ্ঞাভাব ও চৈতন্যশক্তির অত্যন্তা-ভাবের প্রতি ততটা মনোযোগ পড়ে না। লোক বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছে, পৃথিবী যেমন দিবা ও রাত্রি এই দুই অবস্থার অধীন, সেইরূপ জীবদেহ প্রতিদিন নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থার অধীন হইয়া থাকে। জাগ্রদ-বস্থায় স্ব স্ব ব্যাপারে নিরন্তর নিযুক্ত থাকায় আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ এবং ইহাদের অধিষ্ঠাতা মস্তিষ্ক

পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্লান্তি দ্বারা নিদ্রার আবির্ভাব হয়। নিদ্রা মানসিক বৃত্তিবিশেষ। প্রাণি-গণের হৃদয়ই চেতনাস্থান। ক্লান্তিবশে সেই হৃদয় তমো-গুণে সমাচ্ছন্ন হইতে থাকিলে নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদের দৈনন্দিন নিদ্রাকে তামসিক নিদ্রা বলা যায়। নিদ্রাবসন্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ সম্যক্‌রূপে বিষয়গ্রহণে অশক্ত হয়। কিন্তু তাহার বিষয়কামনা ও স্বপ্নদর্শন-জ্ঞান অপরিস্ফুটভাবে থাকে। আত্মাবিরহিত সূক্ষ্ম শরীরে চৈতন্যালোক তমোগ্রস্ত হওয়ায় মৃদুমন্দভাবে মিট্‌ মিট্‌ করিতে থাকে, কাজেই তাহার তাৎকালিক বৈষয়িক জ্ঞানও অপরিস্ফুট হয়। নিদ্রাকালে যে এক প্রকার অজ্ঞানময় জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা নিদ্রাভঙ্গের পরেই স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন-জ্ঞান হইয়া থাকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তার ফল। জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা ঐহিক বিষয় সম্বন্ধে যে সকল চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন এবং নিদ্রিত অবস্থায় অবসন্ন দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে করিতে যা কিছু দেখেন ও ভাবেন এই সকল চিন্তাপ্রবাহ, সত্যাসত্য সঙ্কল্পশত-বিমিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া নিদ্রিতের জড়প্রায় মস্তিষ্কের নিকটে আবির্ভূত হয় এবং কখনও প্রীতিকর কখনও অপ্রীতিকর জ্ঞান জন্মাইয়া

দেয়। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পরেই এই কাল্পনিক জ্ঞান তিরোহিত হয়। কাজেই স্বপ্নদর্শন-জ্ঞানকে অজ্ঞানাত্মক জ্ঞান বলিতে হইবে। সুষুপ্ত ব্যক্তির মন বুদ্ধ্যাদি কারণোপাধিতে লীন হওয়ায় সেরূপ অপরিস্ফুট জ্ঞানও জন্মে না। এইরূপে নিদ্রিত বা সুষুপ্ত ব্যক্তির আত্মা অবসন্ন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে নানাস্থানে বিচরণ করিয়া যথাকালে উপস্থিত হয়েন ও তাঁহার প্রত্যাগমনে প্রবুদ্ধ ও বিশ্রামান্তে নবীভূত ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া পুনর্ব্বার যথোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ভৃত্যবৎ পরিচর্য্যা করিতে থাকেন।

মানবদেহ এক অদ্ভুত যন্ত্র; নিয়ত কার্য্য করিতে করিতে লৌকিক যন্ত্র বিকল হইলে বৈজ্ঞানিক বিধি অনুসারে নূতন উপাদানসামগ্রীর সংযোজন করিতে হয়, তবে সে কল পূর্ব্ববৎ সুচারুরূপে চলে। ঈশ্বররচিত দেহ-যন্ত্র কার্য্য করিতে করিতে বীর্য্যবিহীন বা বিকল না হয় ভাবিয়া ঈশ্বর নিদ্রারূপ বিশ্রামের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথাকালে নিয়মিত নিদ্রারূপ বিশ্রাম অনুভব করিলেই পরিশ্রমবশে পরিক্ষীণ বীর্য্যের পূরণ হয় এবং দেহযন্ত্র নিত্য নবীভাব ধারণ করে। মৃত্যুসময়ে প্রাণিগণের যে নিদ্রা আসিয়া যুঠে, তাহা "অনববোধিনী" বা দীর্ঘনিদ্রা নামে অভিহিত। এই চরম সময়ে আত্মা একাকী দেহ হইতে বহির্গত না হইয়া একবারে নিজালয় সূক্ষ্ম শরীর

লইয়া উৎক্রান্ত হয়েন। তখন জীবনরূপ জ্বলন্ত বাতি একবারে নির্ব্বাপিত হওয়ায় সকলই প্রভাহীন ও মলিন হইয়া পড়ে।

সূক্ষ্ম শরীর অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাতে কর্ম্মফলজন্য সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পরলোকে একটী ভোগদেহ উৎপত্তির কথা এবং কর্ম্মফলের ভোগসাধনই তাহার প্রয়োজন। এই ভোগদেহ মেঘাদির ন্যায় অস্থায়ী। বায়ুর কোনও আকার নাই। ধূম ও জ্যোতি আদি মিলিত হইয়া এক মেঘরূপ আকৃতি ধারণ করে। জলবর্ষণই তাহার প্রয়োজন। এই বর্ষণ-প্রয়োজন সিদ্ধির পরে যেমন মেঘ-রূপ আকার থাকে না ও তাহা আকাশে মিশিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মফলের ভোগ-শেষে ভোগদেহ আর থাকে না ও তাহা পঞ্চভূতের অংশে পরিণত হয়। স্থূল কথা, সর্ব্বত্রই জড় ও চৈতন্যের খেলা জানিবে। পুণ্যাত্মারা পরলোকে পঞ্চভূতের শ্রেষ্ঠাংশের প্রতিচ্ছায়াযুক্ত মৃদু ও মসৃণ মূর্ত্তিতে বিরাজ-মান থাকিয়া যথেচ্ছগামী ও যথেচ্ছভোগী হয়েন। অপর সাধারণ লোকেরা এই পঞ্চভূতের স্থূলাংশ বা জড়াংশের আধিক্যে দুঃখ-সহিষ্ণু একটী ভোগদেহে লীন হইয়া নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় ভাবে শূন্যে অবস্থান করত যমযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ইহারাও বায়ুভূত হইয়া গতিবিধি করিতে সমর্থ, কিন্তু অন্তরীক্ষ ও

ভূলোকেই গতিবিধি করিতে পারে। স্বর্গলোক-পরিসরে উহাদের যাইবার অধিকার নাই। উপরি কথিত ভোগ-দেহ ও আতিবাহিক দেহের স্থিতিকালের নৈয়ত্য নাই। লিঙ্গশরীর দীর্ঘকালস্থায়ী এবং এক স্থূল দেহ বিনিপাতের পরে অপর নূতন স্থূল দেহে বিকাশ হওয়া উহার স্বধর্ম্ম। এইরূপ অভিনব দেহসংঘটন কর্ম্মাশয়ের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

আতিবাহিক দেহ বলিতে ভাবদেহ বা ভাবনাময় দেহ বুঝিবে। ভাবনা-চিন্তা বা কামনা-তন্ময় দেহ। এই ভাবনা-দেহের সত্তা সময়ে জীবকে যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা আমাদের বর্ত্তমান দেহ ধারণ সময়ে অনুভূত সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন জন্য সুখ দুঃখের ন্যায় অপরিস্ফুট ও অচিরস্থায়ী। মোট কথা, ভাবনাদেহ স্বাপ্ন শরীরের অনুরূপ এবং এই শরীরেই পরজন্ম বা ভাবী দেহের স্ফুরণ দেখা যাইয়া থাকে। ভাবী দেহ কৃতকর্ম্মের তারতম্য অনুসারে সঞ্জাত হইয়া থাকে। পুণ্যাধিক্যে মানব পুণ্য শরীর বা দেবগন্ধর্ব্বাদির দেহ পাইয়া থাকে, পাপাধিক্যে ক্লেশময় পশ্বাদি শরীর প্রাপ্ত হয়; পাপ-পুণ্যের ফল তুল্যবল হইলে মানবকে পুনর্ব্বার মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আসিতে হয়। ভবিষ্যতে কিরূপ গতি লাভ হইবে, তাহা মুমূর্ষু ব্যক্তি অপরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারে এবং তাহার এই অপরিস্ফুট জ্ঞান প্রায় মুখের আকৃতি

ও ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মুমূর্ষু কালে জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তির মুখের কোন প্রকার বিকৃতি বা মুখ-কান্তির ব্যত্যয় লক্ষিত হয় না। নিজ চিত্তাভ্যন্তরে সৎস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে কোন কোন সাধু প্রাণবিগমেও যেন হাসিতেছেন এবং নির্নিমেষ লোচনে কি যেন দেখিতেছেন, বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু পাপাচারী দুরাত্মাদের কথা পৃথক্। তাহারা মুমূর্ষু কালে প্রায় বিকট বদন প্রকটিত করে এবং ভীষণ দর্শন জন্য "কে তোমরা, আমি তোমাদিগকে চিনি না, তোমরা আমায় মারিবে না কি" ? ইত্যাদি ভয়সূচক প্রলাপ বলিয়া উঠে। যদি তুমি কখনও মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ ব্যাপার দেখিয়া থাক, তাহা হইলেই আমার উক্ত কথার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ দুই চারি ব্যক্তির মৃত্যুশয্যায় বসিয়া যদি তাহার ভাব ভঙ্গী ও আকারচেষ্টা নিরীক্ষণ ও সঙ্গত অসঙ্গত বাক্য সকল মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তবে এককালে বহুবিষয়ে উপদেশ পাইতে পার। মুমূর্ষুর হাস্যবদন ও বিকট বদনের অর্থ প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে—পুণ্যাত্মা মুমূর্ষু ব্যক্তি, কোন ঋষি তপস্বী বা সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক সমাহূত বা সমাদৃত হইয়া প্রফুল্ল মনে যেন কোনও অপূর্ব্ব আলোকময় প্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন এবং দুষ্কর্ম্মা মুমূর্ষু ব্যক্তি বিকটাকার মারাত্মক প্রেতগণে পরিবেষ্টিত

হইয়া ভয়বিবিগ্ন বিষণ্ণ মনে অন্ধকারময় দেশে যেন প্রবেশ করিতেছে। এই কথা গুলি অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস বলিয়া মনে করিও না। ইহলোকে জীবগণ স্ব স্ব জাতি ও স্ব স্ব শ্রেণীমধ্যে বিচরণ ও বিহার করিয়া থাকে। মনুষ্য-মধ্যে বিশেষতঃ পরস্পর পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই নিয়ম বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয়। সাধু সাধুতে, দুষ্ট দুষ্টে, ধনী ধনীতে, দরিদ্র দরিদ্রে প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করে দেখা যায়। পরলোকেও পূর্ব্বপ্রেত সাধু ও অসাধুর আত্মা মর্ত্ত্যলোক হইতে নূতন অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ও সহায়তা নিমিত্ত ব্যগ্রতা সহকারে অগ্রসর হইয়া থাকে। দুরাত্মার দুশ্চেষ্টা সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির প্রেতাত্মার আকর্ষণী শক্তি ও পরিরক্ষণ চেষ্টা সমধিক বলবতী ও ফলবতী হইয়া থাকে। প্রিয়তম ব্যক্তি বহুপূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে চিরদিনের নিমিত্ত হারাইয়াছ এই জ্ঞান করা উচিত নহে। পরলোকে আমরা কর্ম্মফলবশে সমশ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারিলে উহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইব জানিবে।

রামাক্ষয়। মহাশয়! এক স্থূলশরীর ত্যাগ ও শরীরান্তর পরিগ্রহ তৃণজলোকাবৎ ঘটিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রপাঠে জানা যায়। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, স্থূলদেহ পরিত্যাগের পরেই মানব, ষাট্‌কৌষিক দেহ পায় না;

ইহার মধ্যে কোন কথার প্রামাণ্য ধরিব ? আর একটী কথা—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—কর্ম্মফলের হিসাব নিকাস দিতে হয় না, এখন আবার সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলানুসারে পরলোকে উন্নত ও অবনত পদপ্রাপ্তির কথা তুলিয়া ফের গোলমালে ফেলিলেন ! ক্রমশঃ পরিপক্ব হইয়া যাহা মিছ্‌রি বা ওলায় দাঁড়াইয়াছে, সামান্য দোষে ইক্ষুরসে তাহার পরিণাম না হয় কথঞ্চিৎ সঙ্গত বলিয়া লওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু আপনার প্রস্তাবিত মানবের অধঃপতন যে বড়ই ভীষণ ! কোথায় জীবশ্রেষ্ঠ মানব ? কোথায় বা ঘৃণ্য জঘন্য বন্যপশু ? কি বিসদৃশ পরিণাম !

তর্কবাগীশ। বাপু হে ! এই সম্বন্ধে আমার সমুদয় কথা শেষ হইতে না হইতে তোমার এই নূতন প্রশ্নগুলি উপস্থিত, আমার বক্তব্য বিষয়ের অবান্তরে ইহারও উত্তর শুনিতে পাইবে এবং আমার কথার যে পূর্ব্বাপর কোনও অসঙ্গতি নাই তাহাও বুঝিতে পারিবে।

শাস্ত্রে জন্মমরণ সম্বন্ধে "তৃণজলৌকা" ন্যায়ের উল্লেখ আছে সত্য, অর্থাৎ জলৌকা যেমন তৃণান্তর না ধরিয়া পূর্ব্বধৃত তৃণটী ত্যাগ করে না, সেইরূপে মনুষ্য শরীরান্তর গ্রহণ না করিয়া অবলম্বিত শরীর পরিত্যাগ করে না বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু মানবের পক্ষে ঐ শরীর আতি-বাহিক শরীর বা ভাবদেহ বলিয়া বুঝিতে হইবে, উহা

ভোগসাধন স্থূল দেহ নহে। মনুষ্যই কেবল এই আতি-বাহিক দেহ পাইয়া থাকে, অন্য প্রাণীরা তাহা পায় না। ইহার কারণ পরে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে। যাহা হউক, এই আতিবাহিক দেহই মানবের ভাবী স্থূল দেহের বীজ স্বরূপ, অর্থাৎ ইহার ভোগসময়েই ভাবী ভোগসাধন স্থূল দেহের স্ফুরণ হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রমতে আত্মা শরীরোৎপত্তির কারণ নহে। জীবের কর্ম্মবাসনা বা কর্ম্মাশয়ই শরীরোৎপত্তির বা পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে তোমার মনের সংশয় অনেক পরিমাণে দূর হইবে সন্দেহ নাই। জন্মজন্মান্তরে অর্জ্জিত জ্ঞান ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সঞ্চিত সংস্কার মানবের সূক্ষ্ম শরীরে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূক্ষ্মশরীর চেতনাময় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ বস্তুতেই পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। মৃণ্ময় বা জড়ময় স্থূল দেহ কখনও সেরূপ প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না। আমরা এক্ষণে যে সকল সদসৎ কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতেছি বা সদসৎ চিন্তার অনুক্ষণ অনুধ্যান করিতেছি, এই সকলের একটী সংস্কার বা শক্তি আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে আবদ্ধ বা সংলিপ্ত হইয়া থাকিয়া যাইতেছে। স্থূল শরীরের বিনিপাতেও সে সংস্কার বিলুপ্ত হয় না। জীবের এই কর্ম্মগতি অতি গহন বলিয়া এই তত্ত্বটী সম্যক্রূপে বুঝাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে "বস্ত্রকুসুম" ন্যায় নামক একটী

ন্যায়ের অবতারণা করা হইয়াছে। সদ্‌গন্ধযুক্ত কুসুমের বারম্বার সংসর্গে বস্ত্র যেমন সুবাসিত হয়, সেইরূপে জীবের অনুষ্ঠিত সুকৃত কর্ম্ম ও সচ্চিন্তার প্রবাহ-পরম্পরায় অন্তঃকরণবৃত্তি সংস্কৃত হয়। এইরূপে দুর্গন্ধ-সম্পর্ক বা অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্ম অথবা তদ্বিষয়ক নিরন্তর চিন্তার ফল আবার অতি বিষম বলিয়া বুঝিবে। পুণ্যকর্ম্মের সংস্কার-ফলে মনের উদারতা, নির্ম্মলতা, প্রশান্ত ভাব, প্রীতিভাব, ও মৃদুভাবাদি সাত্বিক গুণের প্রবাহপরম্পরা বহিতে থাকে। অন্য দিকে আবার পাপকর্ম্মের সঞ্চিত ফলের সংস্কারবশে রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, অপচিকীর্ষা, ও তীব্র বিষয়বাসনা আদি উগ্রভাব সকল উদ্দীপিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বৃত্তির উদ্দীপনসাধন স্বয়ং মানবেরই সাধ্যায়ত্ত। মানসিক যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে এই অসার জড় দেহের সাহায্যেই মনুষ্য অসাধ্যসাধনেও সক্ষম। এই জড় দেহ কেবল আত্মার ভোগসাধন নহে, কিন্তু অসীম কর্ম্মসাধন ও অগণ্য ধর্ম্মসাধন। গৃহী হউক বা উদাসীন হউক, মনুষ্যের কর্ম্মানুষ্ঠান অপরিহার্য্য। নিজ ও আত্মীয় পরিজনের জীবন ধারণ নিমিত্ত গৃহস্থকে নিয়ত কর্ম্ম করিতে হয়। ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত উদাসীনকেও ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত দেখা যায়। "শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" এই মহতী কথার উপর নির্ভর

করিয়াই মলাধার অসার এই জড় দেহের সাহায্যে পুরাতন আর্য্যগণ ধর্ম্মপথে কত উন্নত হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে অবৈধ-ভোগ-রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য শরীরে আমরা কত অধস্তলে অবনত। চিত্রের দোষাদোষ নিরীক্ষণে চিত্রকরের চক্ষু অসাধারণ দিব্যশক্তি ধারণ করিয়া থাকে। সঙ্গীতের মাধুর্য্য বা কার্কশ্য অবধারণে সঙ্গীতবিশারদের কর্ণকুহরের অলৌকিক পারিপাট্য দেখা গিয়া থাকে। অস্থিচর্ম্মসমাচ্ছন্ন দেহারণ্যসঞ্চারী গদ-করী ধরিবার নিমিত্ত কর-নাড়ী-পরীক্ষা বিষয়ে বৈদ্যবিশেষের অসামান্য প্রাবীণ্য দেখা গিয়া থাকে। শিক্ষা ও যত্নই এই শক্তিবিশেষের কারণ। ইহলোক কর্ম্মক্ষেত্র ও শিক্ষাভূমি। এই অসার পার্থিব দেহের পটুতা সর্ব্বতোমুখী। যে দিকে যে ভাবে যত্ন সহকারে লাগাও, তাহাতেই ইহার পটুতা দেখা যায়। এই জড় দেহ আবার ক্ষণবিধ্বংসী। আয়ুষ্কালের ক্ষণমাত্র বৃথা ব্যয়িত হইলে কোটি কোটি স্বর্ণ দিয়াও ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। এই সকল বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া যথাকালে কর্ম্মানুষ্ঠান করা চাই। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল কল্পান্তস্থায়ী। ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন এক জন্মের কার্য্য নহে। এই কর্ম্মফল এবং এই কর্ম্মবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ চিত্তপটে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সঞ্চিত সংস্কার যথাকালে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এই উদ্বোধকে লোকে স্বভাব বা

প্রকৃতি এই নাম দিয়া থাকে। যাহা হউক জ্ঞানজ ও কর্ম্মজ কামনার ফল বা সঞ্চিত সংস্কাররাশির প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য অনুসারে ইহজন্মে মানবের জ্ঞানাজ্ঞান, মনোবৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি, কার্য্যরুচি, আগ্রহ ও আসক্তি প্রভৃতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই তারতম্য অনুসারে মনুষ্যের বুদ্ধি, বিদ্যা, স্বভাব, চরিত্র ও ভোগাদির ন্যূনাধিক্য হয়। ঈশ্বরের জীবগঠনের ছাঁচ ও জীবনধারণ এবং ভোগানুভূতির নিয়মাবলি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। তথাপি ইহলোকে জীবের যে ভোগসুখের বৈলক্ষণ্য ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল প্রত্যেক জীবের কর্ম্মফলজন্য ঘটিয়া থাকে বুঝিতে হইবে। "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" এই বাক্যের খাঁটীর সারবত্তা নিয়ত স্মৃতিপথে রাখিতে পারিলে মানবকে খিন্নমান হইতে হয় না।

এই বিষয়ের রহস্য এই—ইতি পূর্ব্বে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা সময়ে পরমাত্মার বহুভবন-কামনা অনুসারে চেতন অচেতন সমুদয় বস্তু সমুৎপন্ন, ইহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এক পরমাত্মাই চেতনের চেতন অথবা বিশ্বজীবনের জীবন। এই পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই সজীব, সচেতন, নিত্য, জাগ্রত বস্তু নাই। প্রথমোৎপন্ন মানবাত্মা বা সংসারী জীব সেই পরমাত্মার কামনাসম্ভূত। মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদির মতে

ব্রহ্মের হৃদয় হইতে কামের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্ম-কন্যা সংকল্পার পুত্র সংকল্প। এই সংকল্প হইতে কামের জন্ম। বিবাহে কন্যাদানসময়ে সকল বেদমতাবলম্বীরা যজুর্ব্বেদোক্ত কামস্তুতিনামক এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া থাকেন,—"কোঽদাৎ, কস্মাঽদাৎ, কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ। কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে"। (কে দান করিয়াছে, কাহাকে দান করিয়াছে এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হয়—কামই দান করিয়াছে কামকেই দান করিয়াছে এবং কামই দাতা ও কামই প্রতিগ্রহীতা; অতএব হে কাম! তোমারই এই বস্তু) এই সকল শ্লেষোক্তির প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে বসিলে অবশ্য এইরূপ প্রতীতি হয় যে, ঈশ্বরের কামনা ও প্রেমধারা ক্রমে তাঁহার প্রতিকৃতিই বিবর্ত্তিত ও তাহা একটী স্বাধীন জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জীবাত্মা আবার ঈশ্বর হইতে যে পরিমাণে চিৎ-শক্তি আদি ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিকৃতির পূর্ণ-বিবর্ত্ত বলিয়া মানিতে হয় এবং ইহলোকে তাঁহার জীবনই উন্নত জীবন বোধে শ্লাঘা করিবার বিলক্ষণ কারণ দৃষ্ট হয়। এইরূপ সমুন্নত ও এই সকল ঐশ্বর্য্যশালী জীবাত্মারও কামনাময় দেহকল্পনা অসঙ্গত বা আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধ নহে।

মানবাত্মার এই সকল ঐশ্বর্য্যমাহাত্ম্য কেবল মন ও বুদ্ধির সহায়তায় ঘটিয়া থাকে মানিতে হইবে। বেদান্তে মন বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণবৃত্তির স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন আন্তরিক কার্য্যে স্বাধীন, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তির অধীন। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী মনের গুণ। এই গুণত্রয়-যোগে মন উন্নত ও বিকৃত হয়। কাজেই স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্মের সঞ্চিত সংস্কার অনুসারে জীবাত্মার কখনও উৎকৃষ্ট কখন বা অপকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। আত্মা স্বভাবতঃ উন্নতিশীল। ইহার কামনাপরম্পরার ইয়ত্তা বা পরিসমাপ্তি নাই। শরীর ও মনের পবিত্রতায় কামনার পবিত্রতা। পবিত্রকামনা সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা। নিয়ত উৎসর্পিণী কামনার উত্তেজনা থাকিলে সংসারী জীব কখনও অবনত হয় না জানিবে। কিন্তু আবার কর্ম্মদোষেই দুষ্কর্ম্মা জীবের অধঃপতন অপরিহার্য্য। এখানেও আবার কর্ম্মফলের প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য অনুসারে স্বভাব ও ভোগাদির তারতম্য লক্ষিত হয়। তির্য্যক্-জাতিমধ্যে গো, অশ্ব, কুক্কুরাদি পশুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশী। এখানেও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের ন্যূনাধিক্যবশে কোন কোন গো, অশ্বাদি শান্ত ও বশ্য এবং কতকগুলি অদান্ত মারকুত বা কামড়াকুত দেখা যায়। এই বিষয়গুলি গীতার চতুর্দ্দশ ও

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিশদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে জানিতে পারিবে,—সত্বগুণান্বিত সাধুরা সঞ্চিতগুণের তারতম্যানুসারে উর্দ্ধলোক অর্থাৎ দেব, পিতৃ গন্ধর্ব্বাদি লোক প্রাপ্ত হয়েন, এবং উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দ ও সুখভোগ করত আরব্ধকর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকিয়া নির্ম্মল জ্ঞানলাভ করিতে থাকেন; পরিশেষে কামনারাহিত্যে ব্রহ্মলোকে যাইতে পারেন এবং তথা হইতে আর তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। রাজসেরা মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে থাকিয়া যায় এবং অহঙ্কার মদ-কামাদি-প্রেরিত হইয়া ক্লেশজনক ও পরপীড়াকর কর্ম্ম করিতে করিতে নিয়ত দুঃখপরম্পরা অনুভব করে। তামসেরা প্রচুর চিৎ-শক্তির অভাবে বা জাড্যদোষে অধঃপথে গমনাগমন করে অর্থাৎ নিকৃষ্ট তির্য্যক্ আদি জাতিতে জন্মিয়া থাকে এবং মোহ ও আলস্যবশে পদে পদে দুঃখভোগ করিতে থাকে।

মোট কথা,—চিৎ-শক্তির ন্যূনাধিক্যবশেই মনুষ্য উন্নত অবনত, গণ্য ও জঘন্য। একটী স্বচ্ছ কাচপাত্রে খানিক নির্ম্মল জল রাখিয়া তাহাতে কতকটা মৃত্তিকা গুলিয়া রাখিয়া দাও। জল ও মাটি স্থির হইলে পাত্রের বহির্দেশ দিয়া নিরীক্ষণ কর--দেখিতে পাইবে—নির্ম্মল, আবিল, কর্দ্দমময়, জল এবং আসল কাদা যেমন স্তরে স্তরে

বসিয়া আছে, সেইরূপ মনুষ্যলোকে স্তরে স্তরে নির্ম্মল বা প্রভাতরল চৈতন্য, চৈতন্য, ও জড়োপহিত চৈতন্য, ও নিরেট জড়ের জঘন্য বিবর্ত্তন বিরাজ করিতেছে এবং সতত সচেষ্ট ও একান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ জ্যোতিষ্মান্ বস্তুরই প্রভাতারল্য, তেজস্বিতা ও ক্রিয়াশীলতা এবং জড় বস্তুর তেজোহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। উপরি কথিত শ্রেণীবিভাগ কেবল কর্ম্মবিপাকবশে কাল্পনিক হইলেও ইহার অর্থগৌরব স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ উত্তম বা অধমলোকপ্রাপ্তি জীবের কর্ম্মফলবশে ঘটিয়া থাকে, ইহাই বার বার বলিতেছি, বলিবার কারণও রহিয়াছে। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলই জীবদেহের পৃষ্ঠাস্থি বা মেরুদণ্ড, কিন্তু মোহান্ধ লোক ইহা না বুঝিয়া, কেহ স্বভাববশে কেহ বা দৈববশে উত্তমাধম অবস্থা ঘটিয়া থাকে বলিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। দেহান্তরার্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্যই দৈব। ইহাই ইহজন্মে ভাগ্য নামে অভিহিত। স্বভাব আবার আপনার শুভাশুভ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন। কাজেই যে পথে যাও না কেন, দেখিবে মানবাত্মাই দৈব, স্বভাব ও কর্ম্ম এই সকলেরই জনক বা স্রষ্টা। জীবের এই কর্ম্মবীজ যথাকালে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তর প্রাপ্তি করায়। পুরুষকারবিহীন লোকই দৈব অবলম্বন করে। পুরুষকারের প্রতি নিয়ত লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে শুভ,

দৈব বা শুভাদৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলও শুভ হয়। সুতরাং সকল শ্রেণীর মানব মনে করিলে নিজের উৎসর্পিণী চেষ্টাতেই ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে। পাপাচারী রাজস বা তামস ব্যক্তিও পাপাচরণ করিতে করিতে অকস্মাৎ বিতৃষ্ণ ও বীতরাগ হইয়া পাপানুষ্ঠান হইতে একবারে বিরত হয় এবং পূর্ব্বকৃত পাপানুষ্ঠান নিমিত্ত অনুতাপ করিতে করিতে নির্ব্বেদবুদ্ধি পাইয়া উন্নতির পথে ধাবমান হইতে থাকে।

পূর্ব্বকথিত উন্নতিলাভ কথার কথা নহে এবং এক-জন্মেরও কর্ম্ম নহে; বস্তুতঃ ইহা জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত কর্ম্মফলসাপেক্ষ। কাজেই যাওয়া আসা বারম্বার করিতে হয় এবং ইহলোক ও পরলোক আমাদের চির-পরিচিত বিচরণভূমি এবং মৃত্যুও পূর্ব্বানুভূত ও পূর্ব্ব-পরিচিত জিনিস। মৃত্যুতে ভয়ের কারণ দেখি না। মৃত্যু জীবের প্রকৃতি। মরণে হাহাকার ও জননে আনন্দানুভব ভ্রান্তিমূলক হইলেও, মরণে পূর্ব্বপরিচিত পুরাণ ব্যক্তির সঙ্গবিচ্ছেদ নির্ব্বেদবুদ্ধি ও জননে নূতন সম্বন্ধিস্থান বিচিত্র নহে। পুরাতনে বিরতি এবং নূতনে প্রীতিপ্রদর্শন প্রকৃতিসিদ্ধ। নূতন আমদানীর ঘোষণায় আনন্দ কোলাহল দেখা যায়। একটু তলিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে,—ইহ জগতে সকল ব্যাপারই স্বার্থভাবমূলক। স্বার্থসিদ্ধির সদ্ভাব ও অভাব জন্যই

লোকের আনন্দ নিরানন্দ ভাব। মৃতের ভাবী মঙ্গলের নিমিত্ত কেহ হাহাকার করে না। মৃতের অসদ্ভাবে স্বার্থের হানি বা অভাব নিমিত্তই লোকের হাহাকার বুঝা যায়। বুঝিলেই বা কি হইবে? ইহ জগতে সকল লোকেই সঙ্গ-লোলুপ মমতা-গ্রস্ত ও মায়া-মুগ্ধ! কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ সকল ব্যক্তিই মায়ামোহবশে অবশ এবং প্রকৃত তত্ত্বগ্রহণে অসমর্থ।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—পূর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মফল ইত্যাদি কথাগুলি অনেকবার প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম শব্দ পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া একবারেই পরিগৃহীত হইল।

মীমাংসাদর্শনাদি শাস্ত্রমতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তোমায় বড় গোলে ফেলিতে হয়, এই ভয়ে এই সম্বন্ধে সহজভাবে কয়েক কথা বলিতেছি।

যে কিছু কার্য্য জীবের শ্রেয়স্কর বা মঙ্গলজনক, তাহার নাম ধর্ম্ম; আর যাহা মনুষ্যের শারীরিক ব্যাপার-সাধ্য অথবা যাহা কিছু করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। ইহ-লোকে কেহ নিষ্কর্ম্মা হইয়া অথবা একবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কখন থাকিতে পারে না। ভাল হউক বা মন্দ হউক, একটা না একটা কর্ম্মে সকলকে প্রবৃত্ত দেখা যায়।

শাস্ত্রে কতকগুলি কার্য্য করিবার বিধি আছে, তাহার নাম বিহিত কর্ম্ম, আর যে কতকগুলি কার্য্য করিতে নিষেধ আছে, তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত। কেহ কেহ বলেন,—শাস্ত্রবিহিত যে কিছু তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ যাহা কিছু তাহা অকর্ম্ম। অর্থ, গুণ, নিত্য, কাম্য, ঐহিক ও পারত্রিক আদি ভেদে কর্ম্মের নানাপ্রকার ভেদ আছে। কাজেই বিহিত-ক্রিয়াসাধ্য গুণই ধর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানই অধর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অধর্ম্ম আচরণের ফল শুভ অশুভ বা সুখ ও দুঃখ। সুখ হউক, আমার দুঃখ না হউক, ইহা সকলেরই ইচ্ছা। এই সুখসাধন ইচ্ছাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। কাজেই অনুষ্ঠাতা পুরুষই আপন শুভাশুভ কর্ম্মফলের স্রষ্টা। আদিতে সুখা-কাঙ্ক্ষা বা সৎপ্রবৃত্তি থাকিলেও মোহবশতঃ আরব্ধ-কর্ম্মের ফল বিপরীত দাঁড়ায় বা দুঃখে পর্য্যবসিত হয়। এই নিমিত্ত কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে জ্ঞান ও বুদ্ধিসহকারে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রের উপ-দেশ এই যে, ক্ষমা, সন্তোষ, শৌচ, সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, দম, নিয়ম, ইন্দ্রিয়সংযম, ঋজুতা, উদারতা, দান, অদ্রোহ, অহিংসা, অক্রোধ, অলোভ, অস্তেয়, দয়া, এবং সর্ব্ব-জীবে সমদৃষ্টি আদি অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের কর্ম্মারম্ভ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মানসিক বৃত্তির পরিচালনা,

অভ্যাস ও চিত্তশুদ্ধি জন্মে। চিত্তশুদ্ধিই সাধনসিদ্ধির উপায়। চিত্তশুদ্ধিসহকারে জ্ঞানযোগপূর্ব্বক মনুষ্য যাহা কিছু বিশ্বজনীন কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই আমাদের পরম সুহৃদ্ ও মরণসময়ে সঙ্গী। কেহ কেহ বলেন,—কর্ম্মই বন্ধনস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিমার্গের বাধক। কোন কোন শাস্ত্রমতে জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত কর্ম্মই মুক্তির কারণ এবং কোন মতে কেবল জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই সকল বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিবার উদ্দেশে কর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে গীতায় যে মত বিবৃত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গীতার ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় এবং ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিলাভ-বিষয়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই আবশ্যকতা ও প্রশস্ততা প্রতিপাদন করিতে গিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত দুইটী মত দেখিতে পাইলাম না। বস্তুতঃ সকাম, নিষ্কাম, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক আদি কর্ম্মের বিভাগ এবং কর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষী ও কর্ম্মফলত্যাগী সাধকের শ্রেণীবিভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগসম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়া-ছেন, তাহা কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিতে পারিলে সকলের পক্ষে কর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মাচরণ হইতে পারে।

গুণাতীত জ্ঞানীর উচ্চসিদ্ধির কথা পৃথক্। কিন্তু আমাদের মত দেহধারীর পক্ষে অশেষ প্রকারে কর্ম্ম-

ত্যাগ করা সম্ভব নহে; তবে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাতেই ভক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম সাধন করা অনায়াসসাধ্য।

কর্ত্তব্য-নির্ণয়—ইতিপূর্ব্বে আমরা ধর্ম্ম ও কর্ম্মসম্বন্ধে যে কিছু আলোচনা করিয়াছি, বক্ষ্যমাণ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য-গুলি উহারই অন্তর্গত হইলেও পৃথগ্‌ভাবে বলিতেছি। এইগুলির গুরুত্বসম্বন্ধে বিশেষরূপে তোমার চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশে পৃথগ্‌ভাবে বলিবার উদ্যম বুঝিবে।

অনুষ্ঠিত কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য হইতে আমাদিগের স্বভাব চরিত্র এবং চিত্তের প্রবণতা আদির পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। মনুষ্য স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয়, গতানুগতিক এবং শান্তিপ্রিয়। ইহারা একাকী থাকিতে চাহে না এবং থাকিতেও পারে না; স্বদলে মিলিত ও দলবদ্ধ হইয়া নির্ব্বিবাদে থাকিতে ভালবাসে এবং আপন অপেক্ষা গুণ ও জ্ঞানবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। স্বদলে মিলিত হইয়া অবস্থান করা প্রাণিমাত্রের স্বভাব হইলেও মনুষ্যে মনুষ্যে মিলন বিভিন্ন প্রকৃতিবশে কখন সুখাবহ কখন ক্লেশজনক হইয়া উঠে। সত্বগুণান্বিত মনুষ্য সৌভাগ্যক্রমে ঐরূপ গুণযুক্ত মনুষ্যের সঙ্গে মিলিত হইলে উভয়েরই প্রকৃত শান্তিসুখ লাভ হয়। ইহাই প্রকৃত একতা, সত্য-প্রবণতা এবং ঈশ্বরপরায়ণতা বুঝিবে। আত্মীয়ে

আত্মীয়ে ও মানবে মানবে একতাবিধান না শিখিলে এক এক জাতীয় একতা ও ধর্ম্মের একতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বসাধন চেষ্টা দুরাশা মাত্র। এক্ষণে মানব-সমাজ যেরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দ্বারা গঠিত, তাহাতে ঐকমত্য ও চিরশান্তির কথা দূরে থাকুক, বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধবিগ্রহ ও বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের উৎপীড়ন প্রভৃতি অশান্তিময় কার্য্যপরম্পরা দৃষ্টে নিয়ত চিত্তক্ষোভ জন্মিয়া থাকে। যখন এইরূপ সমাজে আমাদিগের অবস্থান অপরিহার্য্য, তখন আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর সাধ্যানুসারে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ইহা সম্পাদন করিতে হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের কার্য্য করা বিধেয়। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য গুলি এই—অভয় অর্থাৎ সদনুষ্ঠানে নির্ভীকতা (Fearlessness), চিত্তশুদ্ধি—চিত্তের সুপ্রসন্নতা (Cheerfulness) জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থা (Wishfulness to know or pursuit of wisdom), দান—স্বভোগ্য অন্নাদির যথোচিত সংবিভাগ (Charity), দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম (Control of senses), যজ্ঞ—অধিকারী ভেদে ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান (Sacrificial work), তপঃ (Austerity), স্বাধ্যায় (Study), আর্জ্জব—ঋজুতা

(Uprightness or straight-forwardness), অহিংসা (Harmlessness), সত্য—দৃষ্টার্থ কথনরূপ (Truthfulness), অক্রোধ—তাড়িত হইলেও প্রতিক্রোধ না করা (Absence of anger or angerfreeness), ত্যাগ, উপকার ও অপকারে ঔদাস্য (Resignation), শান্তি (Peace of mind), অপৈশুন্য—পরোক্ষে পরদোষ-কীর্ত্তন-বর্জ্জন (Absence of calumny), জীবে দয়া (Pity for all beings or benevolence), অলোলুপত্ব বা লোভাভাব (Uncovetousness or absence of greed), মৃদুতা (Gentleness), লজ্জা—কুকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে লোকনিন্দাভয় (Modesty), অচপলতা—ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্য (Absence of restlessness), তেজঃ (Energy), ক্ষমা—পরিভব আদিতেও সংরম্ভ-রাহিত্য (Forgiveness), ধৃতি—দুঃখাভিঘাতেও চিত্তের অবিকৃতি (Endurance), শৌচ—বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি (Purity), অদ্রোহ—জিঘাংসারাহিত্য (Forbearance), অতিমানিত্বাভাব—আপনাতে পূজ্যতাভিমান পরিত্যাগ (unconceit or freedom from pride)।

এই গুণগুলিকে দৈবী সম্পৎ বা দেবলভ্য গুণ-(Devine qualities), বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই গুণগ্রাম বহুল পরিমাণে নরাকারে অবতীর্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ও শ্রীগৌরাঙ্গ

এবং অন্যান্য সাধু পুরুষে লক্ষিত হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত গুণ অর্থাৎ দম্ভ—ধন-বিদ্যাদি-জন্য গর্ব্ব (Pride), দর্প (Arrogance), অভিমান (Conceit or over-sensitiveness), ক্রোধ (Anger or wrath), পারুষ্য (Harshness or cruelty), অজ্ঞান বা অবিবেক (Unwisdom), এই গুলি আসুরী সম্পৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

দৈবীসম্পৎশালী ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে অধিকারী এবং আসুরীসম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তি নিত্য সংসারী। কাজেই দৈবী সম্পৎ মোক্ষের কারণ, আর আসুরী সম্পৎ সংসার-বন্ধনের কারণ বলিয়া বুঝিবে।

মোক্ষ ত অনেক দূরের কথা ও অতি দুর্লভ। জীবনের চরম উদ্দেশ্য এই মোক্ষসাধনের নিমিত্তই যে কথিত গুণাবলীর আবশ্যকতা, ইহা মনে করিও না। ঐহিক জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দ কামনা করিলে আমাদিগকে ঐ সকল সদ্‌গুণের আশ্রয় ও সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দাক্ষিণ্য আদি গুণ না থাকিলে প্রথমতঃ লোকসমাজে শান্তি সংস্থাপন, নির্ব্বিবাদে অবস্থান, এবং আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দৈনন্দিন ব্যাপারগুলি অক্লেশে সম্পন্ন হয় না জানিবে। মানবসমাজ একটী মনুষ্যশরীর-সদৃশ। আমাদিগের শরীরের অন্তর্গত প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পৃথক্ পৃথক্

স্থান ও পৃথক্ পৃথক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলি যথানিয়মে সম্পাদিত হইলেই শরীরে জীবনপ্রবাহ অব্যাহতরূপে সঞ্চারিত হইতে থাকে। ইহার অন্যথাচরণে আমাদিগের শারীরিক কল অবশ্য বিকল হইয়া পড়ে। সেইরূপ মানবসমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক মনুষ্যের নির্দ্ধারিত কার্য্য দ্বারা সমাজের পরিপূর্ণতা, এবং প্রত্যেক সমাজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমষ্টিতে ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের জীবনপ্রবাহ অগোচরে নিয়ত সঞ্চারিত হইতেছে বুঝিবে। কাজেই এই চিরন্তন জাগতিক জীবনপ্রবাহের সঙ্গে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনস্রোতের ও কর্ম্মপ্রবাহের সংযোগ ও সম্বন্ধ রহিয়াছে মানিতে হইবে। এই দুশ্ছেদ্য কর্ম্মসম্বন্ধবন্ধন কেবল ঈশ্বরের সেই ক্রিয়াশীলা শক্তির মাহাত্ম্য মাত্র। যখন কর্ম্মের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা স্থির হইল, তখন তাহা অনাসক্ত ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশ তাহা নিয়ত স্মরণ রাখা চাই। সম্পাদ্য কর্ম্মগুলি, জাত মনুষ্যের ঋণ স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ এবং জীবমাত্রের নিকটে ঋণ পরিশোধ করিতে করিতে মনুষ্যকে যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে হয়, এবং এক জীবনে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ না হইলে, বার বার যাতায়াত করিতে হয়, এবং এই কার্ম্মিক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই বুঝিবে। যাহারা

অহঙ্কার, অভিমান, কাম, ক্রোধ, বল প্রভৃতির বশে অন্ধ হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধে প্রকৃত কর্ম্ম সম্পাদনে অবহেলা করে, তাহারা জগতের পাবিপন্থি-স্বরূপ।

রামাক্ষয়। মহাশয়! কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্পর্কে আপনার উপদেশগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে মতান্তর নাই; কিন্তু বিষয়াসক্ত সাংসারিক ব্যক্তির পক্ষে এই উপদেশ সকল সম্যক্‌রূপে পালন করা কষ্টসাধ্য দেখিতেছি।

তর্কবাগীশ। একেবারে "অসাধ্য" না বলিয়া তুমি যে উপদেশগুলি পালন করা "কষ্টসাধ্য" মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, ইহাতে পুনর্ব্বার কথা বলিবার অবকাশ দিলে। আমি বলিতেছি—ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি এবং ঐহিক দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশেই কথিত উপদেশ। এই উপদেশ মহান্ ও সারবান্ ইহা কেবল মুখে স্বীকার করিলেই চলিবে না। এই উপদেশ মত কার্য্য করা চাই। এই উপদেশ মতে কার্য্য করা ভারতবাসী লোকের পক্ষে ক্লেশজনক বোধ করার কারণ নাই। ভারতবাসীরা অন্যান্য অসভ্য মনুষ্য জাতি অপেক্ষা অনেক অংশে উন্নত। চৌর্য্য, মিথ্যাকথন ও নরহত্যা আদি যে দূষণীয়, তাহা ভারতবাসী নিকৃষ্ট বন্য ব্যক্তিও অনবগত নহে। মিষ্ট কথায় মনোরঞ্জন করিতে পারে এরূপ বক্তার অভাব নাই; কিন্তু আপাততঃ অপ্রিয় অথচ পরিণামে পথ্য ও তথ্য কথার বক্তা ও শ্রোতার বড়ই অভাব—এই কথাটী নিত্য স্মরণ রাখা চাই।

এই নিয়ম মতে কার্য্য করিলে সাংসারিক সুখলাভ এবং ইহার অন্যথায় ক্লেশ অনিবার্য্য। ইহা ন্যায্য এবং ইহা অবৈধ, গর্হিত কার্য্য, বলিয়া গুরু উপদেশ দিলেন। অপরিণামদর্শী উষ্ণমস্তিষ্ক শিষ্য উপদেশ অগ্রাহ্য করিল, বিধি লঙ্ঘন করিল, পরিশেষে কর্ম্মদোষে দণ্ডিত হইল। এস্থলে গুরুমুখের মিষ্ট উপদেশ কিছু দিন নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য হইল সত্য, কিন্তু এইরূপ শিষ্যের পক্ষে শিক্ষান্তর বা মহাশিক্ষার প্রয়োজন। দারুণ দুঃখের কঠিন কশাঘাতই তাহার পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রকৃত অভিজ্ঞতা। এইরূপ অভিজ্ঞতাই দুরাচারের দুষ্ক্রিয়া ও দুষ্প্রবৃত্তির পরিসমাপ্তি ও চরমসীমা জানিবে। এইরূপ দুঃখের দণ্ডাঘাতে তাহার মনে চৈতন্যের উদ্বোধ এবং প্রকৃত বিবেকের উন্মেষ হয়। কখন কখন বলবতী বিষয়বাসনার উত্তেজনায় বিবেকশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সত্য, কিন্তু তাহা মেঘাবরণের মত অচিরস্থায়ী। ঐহিক বিষয়বাসনা জন্য সুখ দুঃখ আবার অল্পকাল স্থায়ী। দারুণ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে পানীয় প্রদান কর, পানান্তেই তাহার পিপাসাশান্তি জন্য তৃপ্তি। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান কর, ভোজনান্তে ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য পরিতোষ। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে সম্ভোগ নিমিত্ত কামিনী কাঞ্চন দাও, তাহার কামনিবৃত্তি জন্য পরিতৃপ্তি। এইরূপ ক্ষণিক তৃপ্তিলাভ পর্য্যন্ত ঐহিক সুখের সীমা এবং এইরূপ

সুখ কখন দুঃখাসম্ভিন্ন হইবার নহে। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, শীত গ্রীষ্ম, দিন রাত্রি, আলোক অন্ধকার আদির ন্যায় ঐহিক সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বচর; কাজেই ঐহিক সুখ দুঃখ চক্রনেমির মত আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনশীল। নিবিড় অন্ধকার ভোগ না করিলে যেমন আলোকের আবশ্যকতা ও তৎপ্রতি আস্থা জন্মে না, সেইরূপ দুঃখ ভোগ না করিলে সুখের সম্যক্‌ পরিজ্ঞান হয় না। এই ত এখানকার সুখানুভবের ঐশ্বরিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে ইহলোকে কেহ কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখধারা ভোগ করিবার অধিকারী হয় না, এবং কেহ কখন ঘোর দুঃখ-দুর্দিনে পড়িয়া চিরদিন দীনভাবে অবসন্ন থাকে না।

যখন আমরা দেহধারী মনুষ্যের জীবনের কথাই বলিতেছি, মনুষ্যদেহটাই যখন পাপ-পুণ্য-মিশ্র ফলের পরিণাম বিশেষ, তখন ছোট বড় সকল মনুষ্যেরই মিশ্র ফল সুখ ও দুঃখের নির্দ্ধারিত অংশ ভোগ করিবার কথা। শাস্ত্রে অভাবমোচন বা ইচ্ছাপূরণই সুখনামে অভিহিত। তন্মধ্যে বৈষয়িক সুখের অভাবমাত্রই মনুষ্যজীবনের যত কিছু অভাব নহে। ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের উত্তরোত্তর সমুন্নতির আকাঙ্ক্ষাই মানবজীবনের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা, এবং সেই আকাঙ্ক্ষারূপ অভাবের পূরণই প্রকৃত পরম সুখ জানিবে। ধর্ম্মার্জ্জন বা তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করিতে করিতে আমরা এক্ষণে যে

অবস্থায় পৌঁছিয়াছি, এই অবস্থার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তন্মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে আমরা প্রকৃত সুখ লাভ করিব তাহাও নহে। বস্তুতঃ এই অবস্থার পরে ধর্ম্মমার্গে কত দূর উন্নত হইব, কিরূপেই বা সেই উন্নতি লাভ করিব, ইহ জীবনে অথবা কত জন্ম জন্মান্তরের পরে আমাদের অর্জ্জিত ধর্ম্ম-পাদপের পরিপক্ক ফল আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব—এই সকল ইচ্ছার পূরণার্থেই যত কিছু পর্য্যাকুলতা। কর্ম্মারম্ভের পরে কর্ম্মফলে আসক্তি দূষণীয় হইলেও তাহার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা অন্যায্য নহে। এই আকাঙ্ক্ষারূপ অভাব পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার ব্যাকুলতা ও বন্ধন। তবে জ্ঞানাগ্নি-যোগে এই বন্ধন-রজ্জুর বিনাশ করাই জীবাত্মার মুক্তি ও পরিত্রাণ এবং আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি আদি সকল ঐহিক ব্যাপারের সম্যক্ নিষ্কৃতি ও পর্য্যবসান। ইহাতে এই কয়েকটী বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে—ইন্দ্রিয়াদির সংযম জন্য আপাততঃ কষ্টসাধ্য কার্য্যযোগে আমাদের অভাব পূরণ করিতে পারিলে যে পরিণাম রমণীয় ও সুখের উৎপত্তি হয় তাহা সাত্ত্বিক সুখ; বিষয়েন্দ্রিয়-সম্ভোগ জন্য আপাততঃ রমণীয় কিন্তু পরিণামে বিরস ও মোহকর কার্য্য দ্বারা কামনা পূরণ করিলে যে সুখ জন্মে, তাহা রাজসিক ও তামসিক সুখ, এবং মনুষ্য স্বয়ং এই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই কর্ত্তা ও ভোক্তা। দেবতারা আমাদিগের

সুখ ও দুঃখের স্রষ্টা বলিয়া লোকে যে দোষারোপ করিয়া থাকে, তাহা ভ্রান্তিমূলক জানিবে। বুদ্ধি ও বিবেক সহকারে সদনুষ্ঠান করিতে গিয়া আমরা কখন কখন বিফলপ্রয়াস হই সত্য, কিন্তু তাহাতে একান্ত অবসন্ন হইবার কারণ দেখি না; কিন্তু বৈষয়িক ভোগলালসার আবেগ বশে অবিবেকিতা সহকারে কার্য্যারম্ভে যে কিছু দুঃখ, তাহার প্রতিবিধান নাই এবং এইরূপ কর্ম্মদোষে এই মায়ার দেশে যাতায়াতের ইয়ত্তা নাই।

দেব বা দেবতা শব্দ লইয়া অনেক গোল। এ সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিব। দেবতা বলিতে এক্ষণে আমরা ত্রিদিব-বিহারী অমরগণ বুঝিয়া থাকি। পূর্ব্বে এই অর্থে দেব বা দেবতা শব্দ প্রযুক্ত হইত কিনা বুঝা যায় না। প্রথমে ঋষি-প্রতিপাদ্য পদার্থকেই "দেবতা" বলা হইত। মীমাংসাদর্শন আদি শাস্ত্র মতে দেবতা "মন্ত্রাত্মক" বলিয়া উল্লিখিত। উহাদের আকার বা রূপ ছিল বলিয়া জানা যায় না। পরে দ্যুতিমত্তা ও মহিমা বলে যাঁহারা মহোচ্চ ভাবাপন্ন, পূজ্য ও স্তবার্হ হইলেন, তাঁহারা দেব বা দেবতা নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত প্রাকৃতিক পদার্থ মধ্যে যাহাদের নিত্য উপযোগিতা ও নিত্য প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইতে থাকিল, তাহাদিগকে ঋষিরা দেবতা আখ্যা দিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বৈদিক সময়ে সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রজাপতি

আদি দেবতা শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইলেন এবং দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, চন্দ্র, প্রজাপতি লইয়া তেত্রিশটী দেবতার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। পরে আমাদিগের শাস্ত্রের বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগের বংশবৃদ্ধি জানা যায়। পরে পুরাণাদি শাস্ত্র মতে এক্ষণে দেববৃন্দের সংখ্যা, তাহাদিগের পত্নী ও গণ আদি লইয়া তেত্রিশ কোটি দাঁড়াইয়াছে।

আমাদিগের পূজ্য এই দেববৃন্দের দলবল দেখিয়া শুনিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে বহু-ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে উপহাসের কারণ দেখা যায় না। পাশ্চত্যদিগের মতেও ঈশ্বর, তৎপুত্র ও ঐ পুত্রের জননী (God, Jessus, God mother, ministers of peace, Rectors of light, Angels, Devils &c.) শান্তিদাতা, জ্ঞানাদি-সিদ্ধিদাতা, দেবদূত, দানবাদি লইয়া পূজ্য ও মাননীয় দেবকল্প-দলের সংখ্যা বড় কম নহে। যাহা হউক, আমাদিগের শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণে অসমর্থ হইয়া বৈদেশিকেরা যে নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ দেখি না। আমরা মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে পরম দেবতা বোধে সম্মান করিয়া থাকি, কিন্তু পাশ্চত্যদিগের নিকটে উহারা ঘরের আসবাব-রূপে পরিগণিত। নরাকারে অবতীর্ণ শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধ ও

শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে দিব্য গুণ (Devine qualities)—বিভূষিত জানিয়া আমরা দেবরূপে সভাজনা ও সম্মাননা করিয়া থাকি। পাশ্চাত্যেরা এই সকল পরম পুরুষকে বড় জোর বীর পুরুষ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। যে স্থানে সদ্বিচার-বলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়, ঐ স্থানকে ধর্ম্মালয়, এবং যে বিচারক বলবান্ ও দুর্ব্বল, ধনবান্ ও অধন অর্থী প্রত্যর্থীর উক্তি প্রত্যুক্তি সমভাবে শুনিয়া অবিচলিত চিত্তে স্থির হস্তে তুলাদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক ন্যায় বিচার করেন, তাঁহাকে আমরা ধর্ম্মের অবতার বোধে সম্মান করিয়া থাকি; কিন্তু এই বিষয়ে পাশ্চাত্য-দিগের বুদ্ধি ও ব্যবহার বিভিন্ন। কাজেই ধর্ম্মবিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে পাশ্চাত্যদিগের অনেক মত-বিভেদ। ফলতঃ আমরা একেশ্বরবাদী এবং সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভিন্ন ও কল্পিত রূপের সেবা করায় একেশ্বর-সেবী। "ঋক্" শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাত্মার নাম মাত্র, ইহাই বুঝা যায়। "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋক্ ১। ৬৭। ৪৬) সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর এক, কিন্তু প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য ও অপার মহিমার ব্যাখ্যা করিতে করিতে নানা নাম দিয়া থাকেন। তবে নির্গুণ ও নিরাকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা আমাদিগের সকলের পক্ষে সম্যক্‌রূপে সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া তাঁহার

রূপ কল্পনা ও সেই সেই রূপে, স্ফুলিঙ্গে, অগ্নির ন্যায় ঈশ্বর-শক্তির সদ্ভাব জানিয়া তাঁহার উপাসনা অসঙ্গত নহে। এই নিমিত্ত "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" ইত্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ দেখা যায়। ইহাতে ঈশ্বর-ভাবে ভাবান্বিত হইয়া জ্ঞানী সাধক প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বুঝিয়া ভক্তিভরে যে সেবা করেন, তাহার ফল কদাচ ব্যর্থ হয় না। ইহা না মানিলে শান্তি-স্বস্ত্যায়নাদি জন্য জলবর্ষণ ও রোগমোচনাদি প্রত্যক্ষ ফলের অপলাপ করিতে হয়। "ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে। ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণং"॥ কাষ্ঠ, পাষাণ বা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় দেবতা বিদ্যমান থাকেন না, ইহা জ্ঞানী সাধক বিলক্ষণ জানেন এবং দেবতাত্মক ধ্যানধারণাতেই যে ইষ্টসিদ্ধি, তাহাও তিনি জানেন; তবে অপরিচ্ছিন্নশক্তিমহিম ঈশ্বরকে কল্পিত কামনাময় এবং পরিচ্ছিন্ন প্রতিমাদিতে দেখিবার ও সেবিবার চেষ্টা কেবল চিত্তের স্থিরীকরণ উদ্দেশে জানিবে। পাতঞ্জলদর্শনাদিতে নব যোগীকে প্রথমতঃ ত্র্যাটক সিদ্ধির উপদেশ দেওয়া আছে। স্ফটিকময় কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য বস্তু সম্মুখে রাখিয়া চক্ষুতে জল আসা পর্য্যন্ত তাহা দেখিতে থাকিবে বলিয়া উপদেশ। এইরূপ অভ্যাস করিবার সময়ে যোগী সাধককে নাসাগ্রে দৃষ্টি এবং ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে চিত্ত সমাধান করিতে হয় এবং

ইহাতেই চঞ্চল চিত্তের স্থিরতা সাধন হয়। এই চিত্তের স্থৈর্য্যসাধনই দেবোপাসনার প্রধান অঙ্গ। কালক্রমে স্ফটিকময় সূক্ষ্ম পদার্থাদির পরিবর্ত্তে শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে পূজা ও সম্প্রদায়-ভেদে ভ্রূযুগলের মধ্যে এবং নাসাগ্রে ফোঁটা ও তিলক দিবার ব্যবস্থা হয়। এক্ষণে আবার চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও দেবভাবে ভাবান্বিত হইয়া দেবার্চ্চনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, কেবল ফোঁটা, চিতা কাটাটী সেবা-পূজা অনুষ্ঠানের ভাণমাত্রে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মধ্বজী কপটাচারের এই সকল বাহ্য চিহ্ন, অজ্ঞ মনুষ্যগণকে ছলিবার উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু তাহা কখন ভাবগ্রাহী অন্তর্যামী দেবতার প্রকৃত প্রসাদপ্রাপ্তির অনুকূল হয় না জানিবে।

সময়ে সময়ে উপাসনার ফলসিদ্ধির যে ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে, অকপট ভাব-ভক্তি-হীনতাই তাহার কারণ। বেদবিধি ও বিদ্যাবুদ্ধির অসাধ্য কার্য্য ও মনের সরল নির্ম্মল ভাব দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সত্য যদি সত্য বলিয়া মান, হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া অন্তরে অকৈতব ভাব আন, ধর্ম্মার্থবিষয়ে কখন বিফলযত্ন হইবে না। জীবন-পথ বড়ই সঙ্কট। এখানে কপটাচার চলে না, লৌকিক ও দৈবিক ব্যবহারে সমান সরল ভাব অবলম্বন করা চাই। এই সাদা কথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলে মনের

বোঝা যাইবে এবং মন সরল ও সোজা হইবে। এই বিষয়ে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্যদিগের উপদেশমতে কার্য্য করিলে চলিবে না। তাঁহারা বলেন এক, করেন আর। বিষয়-আশায় শান্তিভঙ্গের কার্য্য কারও না বলিয়া উহাদের ধর্ম্মোপদেশকেরা উপদেশ দিতেছেন, অথচ আপনারাই নিয়ত ইহার বিপরীত কার্য্য করিতেছেন এবং এক কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রান্তরে অশান্তি বিস্তার করিতেছেন। বিজ্ঞানবলে বিদ্যুৎবহ্নির বেগ আয়ত্ত করিয়া উহারা বিত্ত-লালসায় সমুদ্রবক্ষঃ নিয়ত অলোড়িত করিতেছেন এবং দূরদেশে ভীষণ বেশে ভূমিলাভ-লালসায় সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করিয়া তুলিতেছেন। বলিতে কি, আজ কাল পৃথিবীতে যত কিছু অশান্তি, তৎসমুদায় অর্থগৃধ্নু জিগীষু পাশ্চাত্য জাতি হইতে সমুৎপাদিত বুঝিবে। নিরীহ নির্লোভ আর্য্যসন্তান আমরা চাহি না তোমার ভাক্ত ধর্ম্মোপদেশ এবং বুঝি না তোমার বিজ্ঞানের যুক্তিবিশেষ।

আর্য্যদিগের কার্য্যমাত্রেই ধর্ম্মপ্রাণতা এবং শুদ্ধি-মত্তা লক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণ, বাপী-কূপ-তড়াগাদি-খনন, ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, ধান্যচ্ছেদন, জলযান-গঠন আদি সকল বৈষয়িক কার্য্যেই ধর্ম্মবুদ্ধিতে পূজার্চ্চনা ও দেবদেবীর বন্দনা হইয়া থাকে। গৃহীর ধর্ম্ম কর্ম্মা-চরণে পরিণীতা পত্নীর নিত্য উপযোগিতা। এই পত্নী

ধর্ম্মপত্নী নামে অভিহিত। প্রকৃতরূপে পতিপরায়ণা এইরূপ পত্নী হইতে গৃহীর দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা, অতিথিসৎকার, পবিত্র দাম্পত্যসুখ-সাধন, অপত্যোৎপাদন, উৎপাদিত অপত্যের পরিরক্ষণাদি গার্হস্থ আশ্রমের যত কিছু কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সম্যক্ সহায়তা হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্য দ্বারা স্বামীর অনুকূলকারিণী এইরূপ রমণী লইয়াই গৃহস্থ প্রকৃত গৃহী এবং পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী এইরূপ সাধ্বী রমণী প্রকৃত গৃহিণীপদবাচ্য হয়েন।

মস্তকে দেবতা বুদ্ধি, অন্তরে ভকতি ;
পতিপদে রাখি সদা মতি গতি রতি।
রত নিত্য গৃহকাজে, নাহি অন্য মন ;
পতির সুখের তরে করে প্রাণ পণ।
সম্পদে বিপদে যার সহাস্য বদন ;
রোগে শোকে সদা যার প্রেমার্দ্র বচন।
এরূপ রমণীরত্ন লভে যেই জন।
নিত্যই উৎসবময় তাহার ভবন।

ফলে, সতীত্বই রমণীগণের রমণীয়তার কারণ, নিজের নিয়ত রক্ষণের সুদৃঢ় আবরণ, এবং পুরুষের ঐহিক সুখের প্রস্রবণ সন্দেহ নাই।

ইহার বিপরীতাচারিণী রমণী গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা হইলে আবার গৃহস্থের পদে পদে অমঙ্গল হয়। স্ত্রী-চরিত্র লইয়াই আমাদের শাস্ত্রকারকেরা অনেক কথা

লিখিয়াছেন এবং সতীর গুণগান এবং দুষ্টার দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিতে গিয়া অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সম্বন্ধে দেশ দেশান্তরে ও শাস্ত্র শাস্ত্রান্তরে বিবৃত উপদেশ-পরম্পরা কি পর্য্যাপ্ত? এবং দুষ্টা স্ত্রীর দুশ্চরিত বিষয়ে পুরুষ কি এ পর্য্যন্ত সম্যক্ অবহিত? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি "কখনই না," "কখনই না" ইহাই বলিব। হায় রে! ক্ষীণ-কলেবর মর্ত্ত্য নর! কতই তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের আধিপত্য-বিস্তার? এবং কিরূপ তোমার এই দুর্ব্বল নারী-দল-বিজয়ে বুদ্ধিবল আদি আয়োজন-সম্ভার? সত্য করিয়া, মন খুলিয়া বল দেখি, হে পুরুষ! তুমি কি তোমার প্রেমাধার মধুর ভাণ্ডার পরিরক্ষণে সত্যই সমর্থ? তুমি কি মনে কর তোমার উন্নত প্রাকার, প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড-পরিরক্ষিত প্রকোষ্ঠ-দ্বার, নপুংসক প্রহরীগণের তীক্ষ্ণধার তরবার, তোমার যত্নসঞ্চিত জিনিস কি অস্পৃষ্ট ও অনাঘ্রাত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? যদি কেহ অগ্নি বা জল বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হয় এবং যদি কেহ গন্ধবহ বায়ুর গতিরোধ করিতে সক্ষম হয়, তবে সে চলস্বভাবা রমণীকে অঙ্কে রাখিয়া শঙ্কাশূন্য এই অভিমান করিতে পারে।

যদি অমৃত-বিষের পাকে প্রস্তুত কোন পদার্থ কেহ কখন দেখিয়া ও চাকিয়া থাকেন, অথবা প্রকৃত আস্বাদ

গ্রহণে অসমর্থ থাকেন, তবে আমি তাঁহার নিকটে জগন্মোহিনী রমণীর নাম নির্দ্দেশ করিব এবং বলিব—অনুরক্তা ইনি সত্য সত্যই অমৃতনিস্যন্দিনী মনোমোহিনী এবং বিরক্তা বা অন্যাসক্তা ইনিই আবার বিষম বিষময়ী ও তীব্রযাতনাময়ী হয়েন। তবে পুরুষবিশেষে উহার অনুরাগ বা বিরাগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে একান্ত অসমর্থ। এখানে দার্শনিকদিগের অবলম্বিত অনুমানাদি প্রমাণপরম্পরার গতি প্রসর নাই অথবা পদে পদে উহার ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। রূপ, গুণ, ধন, যৌবন, পদ, প্রভুত্ব আদি যাহা কিছু পুরুষের ঐহিক সুখসম্পাদক বলিয়া পরিগণিত, তৎসমুদায়ও দোষদর্শিনী কামিনীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় না। বরং ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিতে উহার অনুরক্তি ও আসক্তি দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এক মহাকবি বলিয়াছেন—পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের প্রীতি পরিদৃশ্যমান বাহ্য কারণ জন্য নহে, অবশ্য উহার কোন অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক কারণ থাকিতে পারে। আর এক কবি বলেন—"ভাল-মন্দের বিচার নাই (রাগঃ পশ্যতি রম্যতাং) অনুরাগের চক্ষে দেখে বলিয়া স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া থাকে"—এই সকল কবিকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমি অবশ্য বলিব—সদৃশ সংযোগের অভাবই এই অপ্রীতিকর বিরাগের কারণ। স্বয়ম্বরাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী-পুরুষ ত

বাহ্য সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া থাকেন, উহাঁরা ভাল মন্দ বিচার করিবার অবকাশ পায়েন না। আমাদের দেশে যাঁহারা বর-কন্যার বিবাহ কার্য্যের ভার লয়েন, তাঁহারাও কন্যার বাহ্য অঙ্গসৌষ্ঠব অথবা বড় জোর বর-কন্যা উভয়ের গণ ও বর্ণ আদির মিলন মাত্র দেখিয়া যোটক মিলন স্থির করেন; কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সংযোগের অনুকূল জাতির প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। বস্তুতঃ কোন্ জাতীয় পুরুষ কোন্ জাতীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইলে প্রকৃত দাম্পত্য-সুখ উপজাত হইবে, তাহা দেখিবার ও বুঝিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত না থাকায় পরিণয়ের ভাবী ফল অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়। তবে আজ কালের প্রথামতে পরিণয়েও যে কখন কখন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরক্তি দেখা যায়, তাহা কাকতালীয়বৎ বিশুদ্ধ যোটক-মিলনের ফলই বলিতে হইবে। আর্য্যজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের পরিণয়বন্ধন আবার ধর্ম্মানুসারে দুশ্ছেদ্য। পরিণীতা পত্নী পতিকে পরম গুরুবৎ জ্ঞান করিয়া আজীবন তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, পতিও এই-রূপ ভার্য্যাকে নিজের অর্দ্ধেক অঙ্গ বোধে তাহার যথাযথ সম্মাননা করিয়া থাকেন। আজ কাল এইরূপ দম্পতীর সংখ্যা ক্রমে কম হইয়া আসিতেছে। বৈদেশিক সংস্রবে বিলাসিতার বৃদ্ধি হইতেছে, এবং বিলাসিতা (civilisa-tion) সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগকে নিয়ত ব্যাপৃত

রাখিবার উপযোগী পূর্ব্বকার গৃহকর্ম্ম দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং আর্য্য-গৃহোচিত পদার্থেও কাহার তাদৃশ অনুরক্তি ও তৃপ্তি দেখা যাইতেছে না। এই সকল নব বিধানের বিষম ফল অনেকেই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু মায়ারূপিণী কামিনীর মোহিনী শক্তি ও যুগধর্ম্মের প্রভাবে কেহ প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ কাল-মাহাত্ম্য বা আর যাহা কিছু বল, সব দেশে সব সময়ে অতীব গহন স্ত্রীর চরিত্রে অবগাহন করা পুরুষের পক্ষে সহজ নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সংসারবিরাগী যতিবর আচার্য্য শঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন—"জ্ঞাতুং ন শক্যঞ্চ কিমস্তি সর্ব্বৈর্যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ং"—সকল পুরুষের দুর্জ্ঞেয় কি? পরে স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর করিলেন—স্ত্রীর চিত্ত ও চরিত সকল পুরুষেরই দুর্জ্ঞেয়। শঙ্করাচার্য্য বেদ, উপনিষৎ আদি নানা শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত ও নিয়ত পরোপকার-ব্রতে রত থাকিয়া যিনি এক অপূর্ব্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে পরব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া যিনি অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এইরূপ আত্মবিজয়ী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও স্ত্রীলোক-দিগের মন ও চরিত্র দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কথাগুলি স্মৃতিপথে রাখিয়া আমাদের সতত সাবধান হওয়া উচিত। এই মর্ম্ম বুঝিয়া সংসারকে লক্ষ্য করিয়া

এক সাধু বলিয়াছিলেন,—হে সংসার! বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে তোমার হাত হইতে অনায়াসে নিস্তার পাইতে পারিতাম, কিন্তু কি করিব, মধ্যে চিত্তোন্মাথিনী কামিনীরূপিণী দুস্তরা নদী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

রামাক্ষয়। (নিজ মনে) ধন্য স্বর্গীয় উপদেশ। আমিও ত এই কথাগুলি অনেক দিন হইতে অনেকবার ভাবিয়াছি ও আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু সংসারী সেজে বিষয়মদে মজে, ধন, মান, মর্য্যাদার আশায়, লৌকিক যশোবাসনার এবং কামকলা-চিন্তায় ভোরপুর হইয়া এত দিন মিছা কাজে কাটাইয়াছি, আসল তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। কামিনী অমৃত-বিষের পাকে প্রস্তুত এই কথাটী অমূল্য! এই অদ্ভুত জিনিসের আশয়ে অথবা উহার নেশায় পড়ে এ সংসারে পুরুষের পক্ষে ঝড় বৃষ্টি-তুফান-বাণে হাবুডুবু খাওয়াই বেশী, প্রকৃত সুখশান্তি-লাভ অতি কম। দিনান্তে নিষ্পাদ্য কর্ম্ম অবসানে যে স্থানে পরিশ্রান্ত হৃদয় বিশ্রাম ও নির্বৃতির আশায় ধাবমান হয়, সেই স্থান অপ্রিয়বাদিনী কুগেহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশাই ত থাকে না। (কুগেহিনীং প্রাপ্য কুতো গৃহে সুখং) "কুভার্য্যা লভিলে গৃহে সুখ বা কোথায়?" ইহার মধ্যে আবার রূপবতী ভার্য্যা পররতা হইলে পুরুষের অসুখের পরিসীমা থাকে না। (বিষং স্ত্রিয়োঽপ্যন্যরতাঃ) "পররতা ভার্য্যা বিষ জানিবে

নিশ্চয়”। হে পুরুষ! সত্য করিয়া বল দেখি, তখন তোমার কি সেই সংসার প্রকৃত প্রমোদাগার বলিয়া বোধ হয়? তখন কি আর তোমার হৃদয়কন্দর স্নেহ-মলয়ে সঞ্চালিত হইতেছে বোধ করিয়া থাক? তখন সেই চাঁদ মুখখানি কি নিয়ত মায়া-মেঘ-সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয় না? তখন কি তোমার মন-চকোর পাখাশূন্য হইতেছে এবং হৃদয়বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইতেছে বোধ কর না? ইহাই ত জীবনসংগ্রামের ভীষণতা! (প্রকাশে, মহাশয়! আপনার অমৃতোপম উপদেশে বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেছি এবং আর কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রার্থনা করিতেছি।

ইহলোকে ব্যাধিপীড়া ও দারিদ্র্যদুঃখের এত প্রাদুর্ভাব কেন? অকালমৃত্যু ঘটে কেন? প্রকৃত সাধু ব্যক্তির এত দুঃখ অসৌভাগ্য ঘটে কেন?

তর্কবাগীশ। তোমার বর্ত্তমান প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া অসাধ্য বোধ করি না, তবে তোমরা আজকাল বিজ্ঞানের দাস বলিয়া সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যাশা করিবে কি না জানি না, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সকল বিষয় সাব্যস্ত করা সুসাধ্য নহে। কাজেই দার্শনিকদিগের অবলম্বিত অনুমানাদি প্রমাণপরম্পরার প্রামাণ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার পরিরক্ষণই স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যরক্ষাই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। মনু-

ষোের সুস্থ শরীরই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ-সিদ্ধির দ্বার স্বরূপ। এই শরীরের স্বাভাবিক ভাবের বিকৃতি বা অন্যথাভাবই ব্যাধি বা পীড়া। এই ব্যাধি মনুষ্য-মধ্যে কিরূপ ,আধিপত্য বিস্তার করিতে'ছ, সে বিষয়ে আর বেশী বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। জগতে মনুষ্য-সংখ্যা যত, ব্যাধির সংখ্যাও তত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মানবদেহ-গঠনের উপযোগী ত্বক্, রক্ত, মাংস আদি উপাদানসামগ্রী এক হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তিগত ব্যাধি প্রায় বিভিন্ন, ইহা বলিলে দোষ হইবে না। শরীর ও মনের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে শরীরের অসুস্থ-তায় মনও অসুস্থ হইয়া পড়ে। আনন্দের বিষয় এই যে, শারীরিক ও মানসিক তাপ প্রশমনের নিমিত্ত উদ্যমশীল ও দয়াশীল জগদ্বাসী নিশ্চিন্ত নহেন। মানবশরীরে রোগোৎপত্তির কারণ নিরূপণ, ভূয়োদর্শনবলে প্রত্যেক রোগের লক্ষণ নির্দ্ধারণ, রোগোপশমনের উপযোগী বিবিধ ঔষধের আবিষ্করণ এবং বিভিন্ন জীব-দেহে প্রযুক্ত ঔষধ সকলের কি প্রকার প্রক্রিয়া, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপ পর্য্যবেক্ষণ আদি কার্য্যে জগতের বিচক্ষণ বিদ্বান্‌গণ নিয়ত ব্যস্ত। এই জড় জীবময় জগতে কোন পদার্থই অকারণে সৃষ্ট হয় নাই, এবং ঈশ্বরের জগৎ-সাম্রাজ্যের পরিচালন বিষয়ে সকল পদার্থেরই অল্পবিস্তরভাবে উপ-যোগিতা ও সহায়তা চলিতেছে বুঝিবে। যেখানে বিষ,

তথায় বিষয় বস্তু এবং যেখানে রোগতাপ, তথায় তন্নি-বারণোপযোগী উপায়ের সম্ভাব আছে জানিবে; কেবল তাহা খুঁজিতে এবং বুঝিতে হইবে। এই বোঝাই প্রকৃত অভিজ্ঞতা। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য অন্ন ও তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা-শান্তির নিমিত্ত পানীয় যেমন উপযোগী বলিয়া জীবমাত্রেই অবগত হইয়াছে, সেইরূপ কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ রোগের প্রশমনোপযোগী হইবে তাহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সহস্র সহস্র শারীরিক তত্ত্ববিশারদ ব্যক্তি নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং নিজ নিজ গবেষণার ফল ঘোষণা করিয়া জগতের উপকার সাধন করিতেছেন। সময়ে সময়ে শারীরিক তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন নূতন মত আবিষ্কৃত, প্রচারিত ও বহুমানিত হইতেছে। রোগ বলিয়া যাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত ও চিকিৎসিত হইতেছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোগ নহে, শরীরাভ্যন্তর্গত কোন কোন ধাতুর পুষ্টিসাধক কোন পদার্থ বা লবণের অভাব বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। উল্টা পথে চলিতে চলিতে কোন কোন মহাত্মা "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া এবং রোগাক্রান্ত শরীরে সেই সেই রোগের বীজ বপন করিয়া অনায়াসে অসাধ্য রোগের শমতা সাধন করিতেছেন। মানবদেহের বাহ্যাভ্যন্তর-তত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য ডাক্তারগণ অস্ত্রচিকিৎসা-কৌশলে ভীষণ কাটা-ছেঁড়াও সুচারুরূপে যোড়াতাড়া লাগাইতেছেন; অগ্নিদগ্ধ দেহে অপর মাংস

সঞ্চারিত করিয়া সত্বরে তাহার সজীবতা সাধন করিতেছেন এবং দেহাভ্যন্তরস্থ অন্ধকারময় কোষ বা অস্থি-মাংসাবৃত অস্বচ্ছ স্থানেও তড়িতের তরলপ্রভা সঞ্চারণ পূর্ব্বক নিমেষমধ্যে ঐ স্থান আলোকিত করিয়া পীড়াপ্রদ পদার্থ নিষ্কাষিত করিতে সমর্থ হইতেছেন। অধিক কি, উঁহাদের নবাবিষ্কৃত প্রণালীমতে মূকেরও বাক্‌শক্তি এবং পঙ্গু প্রভৃতির গতিশক্তি আদি জন্মিতেছে। বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং এই সকল অদ্ভুত আধিপত্য দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইবার কথা; কিন্তু পৃথিবীস্থ বিভিন্ন জাতির আয়ুর্ব্বেদসম্পত্তি মানবদেহের যাবদীয় দুঃখ দূরীকরণবিষয়ে এ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপ পর্য্যাপ্ত, ইহা বলিতে সাহস করি না, বরং জগতের আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান এখনও শৈশবাবস্থাতেই রহিয়াছে, ইহাই বলিব। প্রাথমিক দুঃখ-যন্ত্রণা অথবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-গ্রীষ্মাদি জন্য ক্লেশ নিবারণ করিয়া মনুষ্য যখন অবসর পায়, তখন সে শরীরজ, ইন্দ্রিয়জ সুখ দুঃখের অনুভব করিতে করিতে সেই সুখের বৃদ্ধি অথবা অনুভূত দুঃখের অপনয়ন করিতে চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত লোক ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কখনও হইবে কি না, সন্দেহ। অন্ন হইতে মানব-দেহের উৎপত্তি ও তাহার পুষ্টিসাধন হয়। অন্নই আমাদের প্রাণ, কাজেই অন্নাভাব বড় অভাব। লোকের

এই অন্নাভাব দূর করিতে না পারিলে শারীরিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ফলবতী হইবার নহে। এক প্রদেশে অন্নাভাব ঘটিলে পূর্ব্বসঞ্চিত ধনসম্পত্তির ব্যয়ে অন্য প্রদেশ বা দেশান্তর হইতে অন্ন সংগ্রহ করিতে হয়। যেস্থানে অন্ন এবং অর্থের অভাব ঘটে, তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ হইলে বহুতর লোকের পীড়া, প্রাণবিয়োগ এবং ক্রমে মহামারী ঘটিয়া থাকে। এইরূপ প্রাদেশিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, দেশ দেশান্তর নিরন্ন ও আপন্ন হয়। এই ব্যাপার ত পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে ও আসিতে থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। এমত অবস্থায় এই পৃথিবী দুঃখ-দারিদ্র্যের হস্ত হইতে যে একবারে পরিমুক্ত হইবে এইরূপ আশা দুরাশা মাত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্য-শরীর পাপ-পুণ্য-মিশ্র ফলের সমষ্টিমাত্র এবং ইহাতে সুখ দুঃখ অনুস্যূত বা অবশ্যম্ভাবী ফল এবং এই কর্ম্মফলের ভোগ নিমিত্তই এখানে আমাদের গমনাগমন বুঝিবে।

উপরিভাগে যে মত বিবৃত হইল, ইহাতেই আমাদের অকালমৃত্যু ঘটিবার আভাস পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষ করিয়া কয়েকটী কথা বলিব। পূর্ব্বে আমাদের দেশে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ"—মনুষ্যজীবন সাধারণতঃ শতবর্ষব্যাপী ছিল, তখন অত্রত্য শ্রেষ্ঠজাতীয় লোকেরা বিরাট্ বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ চারিটী আশ্রমের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী

প্রতিপালন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইন্দ্রিয়-গণের অবৈধাচরণ, অতিভোজন, এবং অবৈধ দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক উহাঁরা সসন্তোষচিত্তে হিতভোজী ও মিতভোজী থাকিয়া এবং দীর্ঘজীবীরূপে পরিগণিত হইয়া যথাকালে স্বাভাবিক মৃত্যুতে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিতেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এখান-কার অথবা পাশ্চাত্য সমস্ত সভ্য দেশের সাধারণ জীবিত-কাল অতি কম হইয়া দাঁড়ায়, অথবা গড়ে ২৫ বৎসরের অধিক হয় না। ইহাতেই বিলাসিতাপূর্ণ সভ্য সমাজে অকাল মৃত্যুর প্রাচুর্ভাব বুঝিবে। শারীরিক পীড়াই মৃত্যুর কারণ। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিচারে অথবা শরীরের প্রতি অবৈধ অত্যাচারে পীড়া জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য জরায়ুজ জীব। মনুষ্যশিশু পিতৃদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল মাতৃদেহে অবস্থান করে। পিতামাতার জন-নেন্দ্রিয় অপক্ক, অপরিণত বা পীড়িত থাকিলে শিশু মাতৃ-গর্ভে শয়ান অবস্থাতেই পীড়িত ও বিলীন হয়। এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ শিশুরই মৃত্যুসংখ্যা বেশী এবং পরিণতবয়স্কা বিধবা স্ত্রীর মৃত্যু অতি কম দেখা যায়। বস্তুতঃ অতি শৈশবে কত শিশু সন্তানসন্ততি যে প্রতি-নিয়ত কাল-কবলে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই; প্রকৃত তত্ত্ব লইতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পরি-ণয়ান্তে চঞ্চলমতি ও উচ্ছৃখলগতি দম্পতী কালাকাল

প্রতীক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে যে মনঃক্ষোভ পাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? স্বাভাবিক-বিধি-লঙ্ঘন ও কামপ্রবৃত্তির ফল এইরূপ বিষময় হইয়া থাকে।

ঝড় বাতাসের জোর অনুভূত না হইলেও জীবন্ত বৃক্ষ বা তাহার শাখা সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তৈল ও বর্ত্তি-যুক্ত জ্বলন্ত দীপও অকস্মাৎ নিবিয়া যায়। জীবনের পথে সুখে চলিতে চলিতে বলিষ্ঠ যুবাও সহসা নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার ত অহরহঃ ঘটিতেছে। এমৎ স্থলে বৃক্ষ বা শাখাটী কীট-ক্ষত ছিল এবং মানব-দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর ইত্যাদি কৈয়ফিয়ৎ পর্য্যাপ্ত হয় না, এবং ইহাতে চিত্তের তাদৃশ সন্তোষও জন্মে না। অথচ পীড়া আদি বাহ্য কারণ ব্যতিরেকে ইহলোকে প্রতি-নিয়ত জীবের হঠাৎ তিরোভাব ঘটিতেছে। কোন স্থলে "এই ছিল, এই নাই," "কোথা গেল কি হইল?" বলিয়া হাহাকার উঠিতেছে। কোথায় বা সুখশয্যায় শয়ান নিষ্পাপ শিশু সন্তান, কোথায় বা বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন তরুণ সন্তান, অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থূল ও রোদন-রোল উঠিতেছে। এই সকল বিস্ময়াবহ শোকজনক ব্যাপারের কি কোন বিশিষ্ট কারণ নাই? কোন নিয়ম নাই? অথবা সঙ্গত ব্যাখ্যা নাই? এই প্রকার প্রশ্ন-

পরম্পরা হয়ত যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে সন্দেহ নাই। মনুষ্যবুদ্ধির প্রভাব অনুসারে ইহার উত্তর ত অবশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে অনুমান মাত্র পোষক প্রমাণ; ইহাতে কি তোমরা তৃপ্ত ও তুষ্ট হইবে? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে আপৎ-পাতের প্রতিবিধান নাই, অথবা যাহার সম্যক্ জ্ঞান ও প্রতিবিধান অসম্পূর্ণজ্ঞানশক্তি মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, যাহা জানিলে আমাদের মনে ভীতি-ব্যাকুলতা জন্মিবার আশঙ্কা, তাহা আমাদের না জানাই মঙ্গল।

যখন এ জগতে জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব সর্ব্বানিদান ভগবান্ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটিতেছে বলিয়া জানা যাইতেছে, যখন দেখিতেছ—সাগরের ফেনা ও বুদ্‌বুদরাশি সাগর হইতে সমুদ্ভূত হইয়া এবং কিয়ৎক্ষণ মাত্র চক্‌মক্ করিয়া পুনর্ব্বার সাগরসলিলেই মিশাইয়া যাইতেছে, তখন ইহা অপেক্ষা বেশী জানিবার জীবের প্রয়োজন নাই। ঐহিক সুখ ভোগ শেষ না করিয়া এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া মানব অপরিণত বয়সে সহসা গতাসু হইলে ত তুমি অকাল-মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, কথিত লোকান্তরিত ব্যক্তির ঐহিক কার্য্য সম্যক্‌রূপে যে সাধিত হয়

নাই, তাহার যাইবার সময় যে সমুপস্থিত হয় নাই, তাহা আমাদের জানিবার অবকাশ ও অধিকার কোথায়? বস্তুতঃ যতদূর দেখা ও জানা যাইতেছে, তাহাতে ইহলোক হইতে জীবের যাত্রাকালের নৈয়ত্য নাই এবং তাহার যাত্রাকালের পূর্ণাপূর্ণতা বিষয়ক জ্ঞানলাভ আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এমৎ অবস্থায় ঈশ্বরের যদৃচ্ছা কার্য্যের হেত্বনুসন্ধান না করিয়া, বাদবিচার না তুলিয়া, এককদমাও না টলিয়া সসন্তোষ চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম এবং ইহাই এ সংসারের ভাব—প্রকৃত ভাব ও মহাভাব। ইহা না করিয়া এবং দুরবগাহ ঈশ্বরের নিয়মমাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত ও হতবুদ্ধি মনুষ্য ব্যগ্রতা সহকারে মৃত্যুর ভীষণ কঠোরতা, ঈশ্বরের নিষ্করুণতা আদি উল্লেখ করিতে করিতে যে দোষারোপ করিতে থাকে তাহা নিরুবতা ও ক্ষীণতা মাত্র।

পূর্ব্বে বার বার বলিয়াছি মনুষ্যের কর্ম্মফল ভোগ বহু জন্ম ব্যাপিয়া হইতে থাকে। কে জানে যে উল্লিখিত নবজাত বালক এবং অন্ধের যষ্টিস্বরূপ যুবার শোচনীয় প্রয়াণকাল পূর্ণ হয় নাই? ইহাদের কর্ম্মফলের ভোগ শেষ হয় নাই? কে জানে যে পুরস্কারবিশেষের বিতরণ-বাসনায় পরম পিতা উহাদিগকে স্মরণ বা আহ্বান করেন নাই? এই ব্যাপারে উহাদের বিয়োগকাতর

অন্ধ পিতামাতার ঐহিক যাতনার সমধিক পরিজ্ঞান বা গুরুতর শিক্ষা দিবার উদ্দেশে ঈশ্বরের যে এই আদেশ বা কৌশল নহে তাহাই বা কে বুঝিতে পারে? ফলতঃ হৃদয়মর্ম্মভেদী এই সকল শোকাবহ জটিল বিষয় মানব-দার্শনিকের অগম্য। ময়াবদ্ধ ক্ষীণবুদ্ধি জীব আমরা, আমরা আবার আলোকেও আঁধার দেখিয়া থাকি এবং আকস্মিক বিপৎপাতে আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বিপরীত দিকেই ধাইয়া থাকে।

তুমি বলিতে পার, উল্লিখিত সদ্যঃপ্রসূত বালক এই ত জন্মগ্রহণ মাত্র করিল, তাহার আবার কর্ম্ম কি? তাহার ফলভোগের অবসান বা কি? যে সেই ফলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই পুনর্যাত্রা করিতে হইল? এই সম্বন্ধে তোমার পরিচিত আধুনিক বিষয়ঘটিত দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তুমি ত রাজকার্য্যের নিয়মাবলী অবগত আছ এবং অবশ্য দেখিয়া থাকিতে পার—সাহেবেরা কার্য্যকালের পরিমাণ পূর্ণ করিবার উদ্দেশে অন্ততঃ এক দিনের নিমিত্ত এক প্রদেশের বা কোন জিলার চার্য্য বা কর্ম্মাধিকারের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, পরদিন হয় তাহার পদোন্নতি প্রাপ্তি হয়, না হয় ত তিনি ফর্লো নামক অবকাশ লইয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে সদ্যঃপ্রসূত বালকের অল্পক্ষণ নিমিত্ত জন্মগ্রহণ, কেবল ইহলোকে যাতায়াত-কালের পরিমাণ পূরণ

উদ্দেশে যে, তাহা ঘটিল ইহা স্বীকার করিতে আর কি আপত্তি আছে। ইতঃপর কথিত বালক পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলানুসারে হয় পদোন্নতি পাইবে, না হয় গর্ভবাস-যন্ত্রণারূপ নরকভোগ নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহাকে ধরায় আবির্ভূত হইতে হইবে। ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্যেও এই নিয়ম সঙ্গত বলিয়া অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে।

বর্ত্তমান কালের মনুষ্য অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকেরা যে সমধিক দীর্ঘজীবী ছিল তদ্বিষয়ে ভিন্ন মত হইতে পারে না। "আয়ুর্ব্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং" মনুষ্যের আয়ুষ্কালের পরিমাণ একশত বৎসর ছিল, এই মতের পোষকে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত এক্ষণে ছেলেপুলে হাঁচিলে "শতং জীব" বলিয়া বৃদ্ধেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ইহাতে শতবর্ষজীবন-কামনা ব্যতীত অন্য একটা গুরুতর বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। মানবশরীরের ক্ষণভঙ্গুরতা এত নিশ্চয় যে তীব্র ভাবে ক্ষুৎকার করিলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ুর বিনির্গমের আশঙ্কা থাকে, কাজে কাজেই এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে রক্ষার বাসনায় বৃদ্ধদিগের এই আশীর্ব্বাদ। যাহাহউক, সত্যযুগ স্বভাবের যুগ ছিল। তখন সকল বিষয়েই স্বাভাবিক ভাব, সাত্ত্বিক ভাব, অকপট ও অকৈতব ভাব লক্ষিত ও রক্ষিত হইত, উহার স্থানে

এক্ষণে স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও মায়িকতা দেখা যাইতেছে। এই স্বেচ্ছাচারিতা আদি দোষ বশে মনুষ্যের আয়ুষ্কালের সঙ্কীর্ণতা, ও মায়িকতায় তাহার সকল দিক্ ফাঁকি, বুঝিতে তত্ত্ব, বুঝে ঢেঁকি।

এ জগতে সাধুজনের অসৌভাগ্য ও দুঃখ বেশী বলিয়া যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। কথিত আছে, এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রবনিতা সীতাদেবী আপন অন্তরে সাতটী শেল বা মহদ্দুঃখ থাকার বিষয়ে উল্লেখ করিতে করিতে "সততদুর্গতঃ সজ্জনঃ" (সাধুজন সতত দুঃখান্বিত) বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। সাধুমধ্যে প্রকৃত ও সজ্জিত সাধুর যত্ন অযত্ন সিদ্ধ ভাব বুঝা ভার। মানুষে প্রায় মানুষ চিনিতে পারে না। অচতুর মূর্খ চর্ম্মচক্ষুতে সাধুর সন্ধান পায় না। প্রকৃত রসিক সাধুর সন্ধান লইতে ও বলিতে হইলে সূক্ষ্ম রসের চক্ষুর প্রয়োজন। ভাবের ভাবীই ভাব ধরিতে ও প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ, অন্যে প্রায় বিফলযত্ন হয়। এই ভবের বাজারে ভগবত্তত্ত্বের কেনাবেচা করে, এমন বড় গোলদারি মহাজন কম। স্বকামী, নিষ্কামী, নানাপথচারী পুটলাধারী মুদি পশারীর দলই বেশী। এরূপ ভাক্ত সাধু মুদার ফাটা পড়েন ও কাটা দাঁড়ী ব্যবহারে নিয়ত চাতুরী খেলে বলিয়া তাহাদের ঐহিক কষ্টপরম্পরা চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। যাহার জন্মে নাই সমান দৃষ্টি, ক্লেশ দুঃখ তাহার নিজের

সৃষ্টি বুঝিবে। মনটাই যার হয় নাই সরল, তার ধর্ম্ম কর্ম্মে অনেক গরল। কাজেই এখনও তার গরলপান অনিবার্য্য।

তুমি যে সাধুসকলের ঐহিক দুঃখে দুঃখ অনুভব করিয়া হেত্বনুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়াছ, তাহারা শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃত সাধু হইলে তাহাদের এখনকার বর্ত্তমান দুঃখের প্রায় অবসান হইয়াছে বুঝিবে। বস্তুতঃ এই প্রকার প্রকৃত সাধুর ঐহিক দুঃখাতিশয্য ভোগ, আশু সৌভাগ্যসূচক হইয়া থাকে। অচিরকাল মধ্যে এইরূপ সাধুর পুনর্জ্জন্ম হইলেও সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ উন্নত পদ প্রাপ্তি ও সমধিক সুখভোগ অব্যাহত জানিবে।

তোমার জিজ্ঞাস্য যাবদীয় বিষয়ে প্রায় যথোচিত উত্তর দিয়াছি। সন্তোষ লাভ হওয়া না হওয়া জানি না। জানিবার অপেক্ষাও করি না। আমি নিশ্চয় জানি, এ সংসারে কোন পদার্থ বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ণতা নাই এবং আমাদের প্রার্থনানুরূপ পূর্ণতা লাভের আশাও নাই। কারণ এ জগতের পদার্থজাত মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি আদিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ জীবশ্রেষ্ঠ মানবই বস্তুবিষয়ে অপরি-পূর্ণ। এই মানব বা সংসারী জীব সেই পূর্ণ পরমাত্ম-চৈতন্যের অংশমাত্র। চৈতন্যের অংশ মাত্র পাইয়া এই জীব যেমন চেতনাবান্, সেইরূপ পূর্ণব্রহ্ম হইতে জ্ঞান ও বোধশক্তির অংশ মাত্র পাইয়া তিনি আংশিক জ্ঞানেরই অধিকারী। কাজেই এইরূপ পরিচ্ছিন্নমতি মানবের

জ্ঞাননেত্রের দর্শন সায়ং-সন্ধ্যা-সঞ্চরণশীল বাদুড়ের দর্শনশক্তি অপেক্ষা বেশী বিশদ হইবার নহে। বাদুড়গণ দিবান্ধ, কিন্তু সঙ্কীর্ণশক্তিসম্পন্ন মানব আপন জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে অতি গহন ঈশ্বরের নিয়মমাহাত্ম্য বুঝিতে দিবা-রাত্রি সকল সময়েই অন্ধপ্রায়। যোগাদি বিভূতি ব্যতিরেকে অনন্ত বিশ্বের আধার পরমাত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়াছেন বলিয়া যিনি নিয়ত অভিমানী, তাঁহার চর্ম্ম-চক্ষুর মায়া ছানি এখন কাটে নাই এবং হৃদয়গ্রন্থি খোলে নাই বুঝিবে। পণ্ডিতাভিমানী এইরূপ পাষণ্ডের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ভাঙ্গা-মঙ্গলচণ্ডীর কুস্বপ্ন দেখাইবার মত জ্ঞান করিবে। কল্পনাশক্তির অতীত প্রকৃত ভগবত্তত্ত্ব জানিবার অভিলাষী হইলে প্রথমতঃ আত্ম-প্রত্যয়ানুরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরা অজ্ঞানমাত্র সহচর লইয়া এখানে আসিয়া থাকি, পরে জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিষয়ে পরাধীনতায় কিছুকাল, অজ্ঞান নিদ্রায় কিছুকাল, শারীরিক ব্যাধিতে কিছুকাল, মায়ামোহবশে কিছুকাল যাপন করিতে হয়। ইহার মধ্যে ঐহিক বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে বসিলে শিশিরবিন্দু হইতে মহাসাগর, বালুকণা হইতে সমুন্নত ভূধর, দুর্ব্বাদল হইতে বৃহৎ বটাশ্বত্থ, খদ্যোত হইতে প্রদ্যোত-মরীচিমালী, কীটাণু হইতে প্রবীণ বারণ, ছায়া হইতে ঘোর মায়ান্ধকার, আধ আধ কথা হইতে বিশদ বেদবাক্য, স্তম্ভ হইতে পরব্রহ্ম, এবং জনন হইতে মরণ

পর্য্যন্ত সকলই সম্যক্‌রূপে জানিতে বা জানিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে। বৈষয়িক প্রজ্ঞান লাভ করিয়া ঔষধ আদি দ্বারা শারীরিক ব্যাধির প্রশমন এবং বিবেকজ জ্ঞান দ্বারা মানসিক ব্যাধি—কাম মোহ আদির নিবারণ করিয়া সাংসারিক দুঃখতাপ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং সাংসারিক জীবের নিষ্পাদ্য কার্য্যের সীমা বা শেষ নাই? কিন্তু জীবনের সীমা ও মৃত্যুর মহিমা সে বিলক্ষণ অবগত আছে ও প্রতিক্ষণ দেখিতেছে। কাজেই নির্দ্ধারিত এক জীবিত সময়ের মধ্যে জীবের সম্পাদ্য কার্য্য শেষ হইবার নহে। এই নিমিত্ত এ সংসারে জীবের বারবার যাওয়া আসা যে অনিবার্য্য এবং এ সংসার যে পরীক্ষার ভূমি, রমণীয় ক্রীড়াকানন নহে, এই কথাগুলি নিয়ত মনে রাখিবে।

উপরিভাগে মানবজীবনের যে অশেষ কার্য্যভার ও হিসাব দিবার কথা শুনিলে, তাহাতে তোমার দৈনিক হিসাবের যে প্রয়োজন তাহা অবশ্য বুঝিয়া থাকিবে। দিনান্তে সূর্য্যাস্তসময়ে অথবা শয়নকালে তোমার দৈনিক কার্য্যের রোকড়ের পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিবে, যিনি তোমার অচেতন গৃহে চৈতন্যালোক প্রদান করিয়াছেন, অন্তর্য্যামী যিনি অন্তরে বাহিরে নিয়ত অগোচরে থাকিয়া সাক্ষীরূপে তোমার কৃত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে কতবার স্মরণ করিয়াছ? যদি বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ততা

বশতঃ স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে তোমার জীবনের একটী দিন বৃথা অতিবাহিত হইল জ্ঞান করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবে। এইরূপ উপকর্ত্তার অনুকম্পা ও অনুরাগে জাগিয়া আবার একবারে অঘোরে ঘুমান ভাল নয়। বিষয়াসক্ত সংসারী জীবের নিয়ত চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে; কাজেই তাহার লম্বা চৌড়া ধ্যান ধারণা বা কঠোর তপঃসাধনাদি ছলে ঈশ্বরের অর্চ্চনা সাধ্যায়ত্ত নহে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। আপামর সকলের নিকট হইতেই বেদাচারসম্মত বন্দনাদি ঈশ্বর অপেক্ষা করেন ইহা কদাচ মনে করিও না। সংসারী জীব কেবল আত্মহিতকামনায় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিলেই পর্য্যাপ্ত। বস্তুতঃ ভক্তিভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্তর হইতে সরল ভাব-ব্যাক্তিতেই ঈশ্বরোপাসনা সম্পন্ন হয় বুঝিবে। জীবের এইরূপ অকপট প্রার্থনা, ভীতিজড় জিহ্বা দ্বারা সম্যক্‌রূপে উক্ত বা অনুক্ত হইলেও অন্তর্যামী ভাবগ্রাহী পুরুষোত্তম তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রহণ করিবার বাহ্য চিহ্ন প্রত্যক্ষীভূত না হইলেই সংসারী জীবের যাবদীয় যত্ন বিফল হইল ইহা মনে না করিয়া তাহার নিজেরই এবারের প্রযত্ন সম্যক্‌রূপে পর্য্যাপ্ত হয় নাই ইহাই স্থির জানিবে। আমাদের যত্নের অসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষিত ফলের একান্ত অভাবসূচক নহে, এই কথাটী মনে রাখিলে আমাদের মঙ্গল ও সমধিকরূপে পুনরুদ্যম সফল হইবে

সন্দেহ নাই। সেই কৃপাকল্পতরুর ফল সদাই ফলিতেছে ও ঝুলিতেছে, প্রকৃত অধিকারী তাহা পাইয়া থাকেন; কিন্তু ঈশ্বরসন্নিধানে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত ফল কদাচিৎ হাতে হাতে পাওয়া যায়। তবে আনুষঙ্গিক উত্তম ফলের অভাব হয় না। ঈশ্বরপরায়ণ মানবের সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে সে যে দুরভিসন্ধি ও দুষ্প্রবৃত্তি হইতে পরিরক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরানুরাগ বশতঃ ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মভীরু ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি প্রায় প্রশান্তচিত্ত ও বিনীত হইয়া থাকেন। তাঁহার আন্তরিক সচ্চিন্তা ও সদ্বুদ্ধির নিকটে অসচ্চিন্তা অসৎপ্রবৃত্তি অবকাশই পায় না। তিনি কখন আপন ইষ্টকামনার সঙ্গে সঙ্গে পরের অনিষ্ট প্রার্থনা করেন না। এইরূপ অবিশুদ্ধ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তিনি সত্ত্বগুণান্বিত, পাকা পোক্ত ভক্ত এবং কায়মনোবাক্য বিষয়ে সম্যক্‌রূপে সংযত। ভক্তিই তাঁহার উপচার, ভক্তি উপহার এবং ভক্তি তাঁহার আত্মসার। ফলে, ঈশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবন-মরুস্থলীর মধ্যে শান্তিদায়িনী শীতল ছায়া বোধ করিবে। চলিতে চলিতে ক্লান্তি বোধ করিলে ছায়াতলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে থাক। এই পথে চলিবার সময়ে বক্ষ্যমাণ সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বাক্যগুলি মনে রাখিতে পারিলে সুখে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে।

১। নিদ্রিত ব্যক্তি কখন জাগ্রতের সন্ধান দিতে পারে না।

২। মানুষে মানুষ চিনিতে পারে না, মনের মানুষও প্রায় মিলে না।

৩। স্থূলে ভুল হওয়াই কষ্ট। ফুল ফল দুদিক্ যায় মূলও বিনষ্ট।

৪। গাছপাকা ফল দেখিলেই জানা যায়। যত্নপক্ক ফল তত সুস্বাদু না হয়।

৫। আশা প্রতারণা করিল বলিয়া তুমি ভয় পাইও না। কারণ তুমি জান না—ভয়ও হয় ত তুল্যরূপে মিথ্যা-বাদী সাব্যস্ত হইতে পারে।

৬। ইহকালে মুক্তহস্ত হইলে বড় ঠকিতে হয়। কিন্তু দৃঢ়মুষ্টি হওয়া অপেক্ষা মুক্তহস্ত হওয়া ভাল।

৭। ঠোঁট কাটা হইলে প্রায় জিভ্ কাটিতে হয়।

৮। জিহ্বার যথেচ্ছ ব্যবহার করার পূর্ব্বে বিবেকের নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর।

৯। খোসামুদের চাটু উক্তি অপেক্ষা স্পষ্টবাদীর কটূক্তি মিষ্ট ও পরিণামে ইষ্টপ্রদ।

১০। অরুণোদয়ে কেবল পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া আলো প্রবেশ করে, কিন্তু জ্ঞান-সূর্য্যের সমুদয়ে সমুদায় দ্বার বাহ্যাভ্যন্তর আলোকিত হয়।

১১। মধুলোভে মধুকর বুলে, মূলের তত্ব সে লয় না মূলে। ফুলে মধু মূলের রসে, মধুপ তা বুঝিবে কিসে।

১২। উচ্চ মসিদে চড়ে দিন দুপুরে ডাকাডাকি করেও যে দেবতার হাজির পায় না, তিনি কিন্তু গিরি-গহ্বরে ঘোর অন্ধকারে ধীরে ধীরে গিয়া মৌনী ধ্যানী জ্ঞানীর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

১৩। সংশয়ারূঢ় দৃঢ় পামর হৃদয়, পরমেশের পাবন আসন নহে।

১৪। মিস্টমধুর বাক্যে অনুরাগের এবং বাক্-পারুষ্যবশে বিরাগের ভাজন হইতে হয়, ইহা না হইলে কোকিলের কলকূজনে লোকের কেন সাধ, এবং গাধারই বা কি অপরাধ?

১৫। দণ্ডকাষায়ধারী জটাবিভূতিবিহারী লম্বমান-দাড়ী সকলকেই ভবের কাণ্ডারী বলিয়া গ্রহণ করিও না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এপারের বা অপর পারের সমাচার দিতে পারেন না। ভস্মের রহস্য বুঝা চাই।

১৬। তোমার জীবনের পথ প্রায় শেষ হইয়াছে। সম্মুখে বিস্তৃত মৃত্যুভূমি-পরিসর। নূতন দেশ, আবার নূতন কারবার। তুমি এদেশের হাট হদ্দ কতক পরি-মাণে অবগত। এক্ষণে গন্তব্য নূতন দেশের সমাচার জানিবার ইচ্ছা রাখিলে, ঐ যে দুঃখের ছোট দ্বার দিয়া

নবাগত শিশু উঁকি মারিতেছে, তাহার নিকটে জানিয়া লইতে পার। শিশুটী আচার্য্য শঙ্করের হস্তামলকের মত মৌনী। সব কথা বা সকল সমাচার স্পষ্টরূপে বলিতে পারিবে না, কিন্তু উহার আকার ইঙ্গিত ও শরীর-চেষ্টা দেখিয়া তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় বিলক্ষণরূপে বুঝিয়া লইতে পারিবে। যদি উহার আকার-চেষ্টার অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পার, তাহা হইলে উহার নিত্যসঙ্গিনী জননী অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারিবে। বস্তুতঃ শিশুর আকৃতি, বদন-বিকৃতি, মৃদু-হাসি, অঙ্গচালন, ওষ্ঠাধর-স্ফুরণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন এবং রোদন আদিতে কি সুন্দর মধুর ভাব—নবাগত দিব্যভাব। এই সরল নির্ম্মল ভাব এখনও পার্থিব ধূলায় মলিন বা কুসঙ্গ-দোষে দূষিত হয় নাই। যদি ইহলোকে থাকিতে থাকিতে স্বর্গীয় সরল দেবভাবের আভাস এবং অন্তরঙ্গতার তত্ত্ব জানিবার অভিলাষ রাখ, তবে শিশুর স্বভাব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহাতে দেখিতে পাইবে,—অপরের মনোগত ভাবভক্তি বুঝিবার বিষয়ে শিশুদের কি অদ্ভুত শক্তি। কোন ব্যক্তি অনুরাগভরে মনে মনে ভাল না বাসিয়া কেবল খাতিরে অপরের শিশুকে কোলে লইবার নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ করিলেও তাহার কোলে শিশু কদাচ যাইবে না; বলপূর্ব্বক কোলে লইলেও অঙ্গস্পর্শ-মাত্র শিশু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া এবং সুখানুভব

না করিয়া অধীরভাবে মাতা কিংবা যে কেহ তাহাকে ভালবাসে বলিয়া বুঝে, তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয় এই যে, বড় হইতে থাকিলে শিশুদের এই আন্তরিক ভাবাভিজ্ঞতা থাকে না। কেন থাকে না, এই রহস্য বুঝা সহজ নহে; কিন্তু বুঝিলে মনের বোঝা যায় ও মনটাও সরল সোজা হয়। তবে এই সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিলে ও সিদ্ধান্ত করিলে বিশেষ দোষ লক্ষিত হয় না। বাহ্যজ্ঞান ও বাক্‌শক্তির অভাব বা ন্যূনতা, মৌনভাব অথবা আন্তরিক ভাবাভিজ্ঞতার পোষক। উল্টা দিক্ দিয়া দেখিলেও পূর্ব্বমত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের বহির্মুখ ভাব এবং বাক্‌শক্তির বিস্তারে আন্তরিক জ্ঞানের সঙ্কোচভাব। প্রকৃত রহস্য এই—মৌনভাব আন্তরিক জ্ঞানের জনক, এবং আন্তরিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জনক।

১৭। আজ্ কাল্ পিতামহের কথিত শাস্ত্রের উপদেশে লোকের ততটা আস্থা দেখা যায় না। পুরাতন শুষ্ক পুষ্পে মধুকর মধুর আকিঞ্চন রাখে না।

১৮। জীবের জনন মরণ বিধাতার লীলাখেলা মাত্র। ইহাতে অন্য কোন গূঢ় রহস্য বুঝা যায় না, তবে মৃত্যুই জীবনের পরিণাম; কিন্তু তাহা পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি মনে করিও না। সময়-সাগরের এক তরঙ্গাঘাতে বুদ্‌বুদের মত জীবের সমুত্থান এবং অপর তরঙ্গাঘাতে

নিমিষমধ্যে অন্তর্ধান। খেলার সামগ্রী বলিয়া আমাদের ইহাতে কোন কৃতিত্ব নাই এবং কিছুই ইচ্ছার আয়ত্ত নহে। তবে নটবৎ বিভিন্ন বেশে মর্ত্ত্যরঙ্গে আগমন ও নিষ্ক্রমণের কারণ ঈশ্বরই জানেন।

১৯। মনের আশার ইয়ত্তা নাই, যা চাই তা কোথায় পাই, আগে চৌদ্দ পোয়ার পুঁজি পাটা বুঝা চাই, একবারে হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরার আশা করা এবং গুবরে পোকার পদ্মমধুর বাসনা করা সমান। আগে চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হবে, তবে ত হাতে স্বর্গ পাবে। অন্তরের অন্তর্বেদ্য সেই নিত্যসিদ্ধ বস্তু পাইবার বাসনা রাখিলে, ভক্তিভরে চিত্তাভ্যন্তরে চিন্তা করা চাই। এখানে ফুল, নৈবেদ্য, সেলাম সিন্নির প্রয়োজন নাই।

২০। প্রাপ্ত ধন হস্তগত হলো না; এত নয় কম বিড়ম্বনা। কাহার দোষ তাহার সন্ধান কর, তবে মতামত প্রকাশ কর। বেদ-বৃক্ষের প্রতি শাখায়, পাতায় পাতায় খুঁজিয়া বেদব্যাস আদি ঋষিরা হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন নাই, পরে তাঁহাদের আন্তরিক বিক্লবতা বুঝিয়া দয়াময় জগৎসখা স্বয়ং দেখা দিয়া কৃতার্থ করেন, এমত অবস্থায় সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণে ত্রিগুণিত ঘোর মায়া-ডোরে বদ্ধ জীবের সে তত্ত্বজ্ঞানের বাসনা বৃথা। এইরূপ জীব কেবল চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিয়া সেই অন্তর্যামী জগৎস্বামীর সন্ধান কিরূপে

পাইবে? তবে আন্তরিক ইচ্ছা রাখিলে আপন ঘরের বাদী চির বিরোধী অদান্ত মনকে শান্ত করা চাই।

২১। পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্য রূপই কেবল একমাত্র রূপ নহে। এই রূপময় জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আন্তর চক্ষুর বিকাশে আমরা ক্রমে জ্ঞানময় জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হই এবং ইহাতে যেরূপ অপার আনন্দ অনুভব হয়, সেইরূপ নামরূপে ব্যক্ত জগতের কথা শুনিতে শুনিতে আমরা অব্যক্ত নামময়—শব্দময়—নাদময়—জগতে উপনীত হইয়া যে অলৌকিক মহানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হই, তাহা সাত্ত্বিক ভূমানন্দ; ইহলোকে তাহার তুলনা নাই। চক্ষু-কর্ণ-গ্রাহ্য এই রূপময় ও নামময় জগতের সমকালীন সাত্ত্বিক জ্ঞানই তাল-লয়-বিশুদ্ধ সুরজ্ঞান—নাদজ্ঞান—নাদমূল-ব্রহ্মজ্ঞান বুঝিবে। কাজেই এইরূপ জ্ঞানলাভ কেবল চক্ষু ও কর্ণের আন্তরিক ব্যাপারসাধ্য।

২২। সংসারী সাজিয়া এবং বিষয়মদে মজিয়া নিরুদ্যম হইলে চলিবে না। অবলম্বিত গার্হস্থ্য-ব্রত-পালন ও যথোচিত মতে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। 'আর পারি না, আমি সকলের নিমিত্ত নিয়ত এত পরিশ্রম করিয়া মরিব, আমার সুখের ও মুখের দিকে কেহ তাকাইবে না' বলিয়া আক্ষেপ করা অনুচিত। যখন

সংসার-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়াছ, তখন পাড়ি জমাও, চল চালাও, প্রাণপণে শেষ পর্য্যন্ত দেখ। সামান্য তুফানে বহু মহাজনের মাল ডুবাইও না। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, কিন্তু এই স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে পরার্থপরতা আপনা হইতে আসিয়া থাকে এবং ক্রমে তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া উচিত। নচেৎ কেবল স্বার্থপরতা বা আত্মসর্ব্বস্বতা বশে ইহলোকে লোকের পদে পদে বিপদ্ ঘটনার আশঙ্কা। স্বার্থত্যাগ বা পরার্থানুরাগ না হইলে বিরাগ জন্মে না। কেবল স্বার্থপরতা রাজসিক ও তামসিক বৃত্তি এবং তাহা একান্ত নীচ প্রবৃত্তি। মনুষ্য প্রবৃত্তির দাস। এই প্রবৃত্তিমধ্যে উন্নত প্রবৃত্তি নিয়ত উৎসর্পিণী; তাহা উজানদিকে ধাইয়া থাকে। মনের উন্নতিতে কর্ম্মের উন্নতি, কর্ম্মের উন্নতিতে ধর্ম্মের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতিতে আত্মার উন্নতি; ইহাই ত মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও পরম পুরুষার্থ। আত্মতত্ত্ব-বিহীন লোকের ব্রহ্ম-তত্ত্বে অধিকার নাই।

২৩। এ জগতে আসল জিনিষ মিলা ভার। নকল লইয়াই যত কারবার। আমিও নকল, তুমিও নকল, কিন্তু ইহা যে বুঝিতে পারা যায় না, ইহাই চমৎকার। কেবল তেজঃপদার্থ নিত্য একইপ্রকার। দীপ হইতে প্রবর্ত্তিত দীপ, চেনা ভার। কাজেই তেজের তেজ! পরম তেজ সদাই নির্ব্বিকার। ত্রিগুণময় চোদ্দ-

পোওয়াতেই যত ফের ফার, জড়াকারেই যত কিছু বিকার। কাজেই জড়াকারের সদাই কোল আঁধার, এক দেখিতে দেখে আর, চিনিতে নারে আপনি আপনার, তার শনে ধোঁকা দুর্নিবার। যাহা কিছু আসলের সদৃশ বা নিকটবর্ত্তী আদর্শ, তাহাই দেখিতে সুন্দর ও চমৎকার। আদর্শের দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত হইও না। সাত নকলে আসল খাস্ত—এই কথাটী কদাচ ভুলিও না।

২৪। এবার যা হবার তা হইয়া গেল। ভবের দোকানদারি শেষ হইল। অবোধ মন পাষাণ ভারি, চিরদিন একই রকম রহিয়া গেল। স্থিরচিত্তে দৃঢ়হস্তে তুলাদণ্ড ধরা হলো না, বেচাকেনায় লাভ হলো না, বুঝি আসল পুঁজি নষ্ট হলো। যদি হাতের পুঁজি রাখিতে চাও, তবে সুধীর সাধুর শরণ লও। এইরূপ সাধুই ঈশ্বরের সমধিক সমীপবর্ত্তী।

২৫। অসময়ে কেহ সগায় থাকে না। গো পেলে বাপ্ পোয়ে ছাড়ে না। আপনার জিনিসও আপনার হয় না। আপন রসনাও একটী কথা কয় না। নিজের হাত একটী অঙ্গুলি তোলে না। দিন থাকিতে আপন পর ভুলিয়া থেকো, দয়াময় হরি সদয় সব সময়—এই কথাটী মনে রেখো।

রামাক্ষয়। (নিজ মনে) যাহা জ্ঞাতব্য, প্রায় তৎ-সমুদায়ই ত তর্কবাগীশ মহাশয় উপদেশচ্ছলে বলিয়া

দিলেন। কিন্তু উপদেশমতে কার্য্য করা ঘটিল কৈ? জীবনের অধিকাংশ সময়ই অনবধানবশে পূর্ব্বে বৃথা কাজে অতিবাহিত হইয়াছে। এখন অন্তিমকাল উপস্থিত। "তৃতীয়ে নার্জ্জিতঞ্চ পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি"—(যথা-কালে ধর্ম্মার্জ্জন যে জন না করিল। চরম সময়ে সে আর কি করিবে বল॥) ইহা বলিয়া কদাচ বিরত হওয়া উচিত হয় না, এবং আমি কখনও বিরত হইব না। যতদূর পারি যত্ন করিব। স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরই সকলের মূল। ইহাই ত তর্কবাগীশের উপদেশের সার মর্ম্ম। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনাতেও এই সঙ্কেতবাণী এবং এই উপদেশ পাওয়া যায়। প্রথমে কিছুই ত ছিল না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য ও তাহার বক্তা ও শ্রোতা কেহই ছিল না। কেবল করুণাময় পরমাত্মার ইচ্ছা ও যত্নে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত এবং এইরূপে সুসজ্জিত। সেই পরমাত্মার পরা শক্তির এক কণা আমাতেও ত বিরাজ করিতেছে এবং সেই শক্তি অনুসারে আমার অন্তরে জীবনস্রোত এখনও অবাধে বহিতেছে। এখনও যত-চিত্তে যত্ন করিলে নিজ নিষ্পাদ্য কার্য্য সম্পাদনে কেনই বা অকৃতকার্য্য হইব? যখন সেই ঐশী শক্তিবলে এই ভব-নদীর উপকূলে এক বিস্তৃত পান্থশালায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তখন আর তাদৃশ ভয়ের কারণ দেখি না। এখানে চৌদিকে বহুতর যাত্রীর সমাগম দেখি-

তেছি। সকলেই অপর পারে যাইবার নিমিত্ত সমুৎসুক। যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে অনেকেই আমারই মত প্রায় নিঃসম্বল এবং বস্তুবিষয়ে অসংযমী। যাহা হউক, আমি সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি এবং সৎসঙ্গ লাভ করিতে এবং প্রকৃত কাণ্ডারীর সন্ধান নিমিত্ত নিয়ত যত্ন করিতেছি। কেবল মনটাই এখনও নিজ স্বভাবগুণে বিগুণতাচরণ করিতেছে এবং এক এক বার লুকোচুরি ও চাতুরী খেলিতেছে।

আর কেন ভাই মন! চঞ্চলতা প্রকাশ কর? শান্ত হও। উড়ে উড়ে নানাস্থানে বুলে, গাছের ফলে কয়দিন চলে, তাও ত ভাই! বুঝিয়া দেখিয়াছ। এখন ক্ষান্ত হও এবং কালী-কল্পতরুর তলে বসে, সসন্তোষে একবার সহায়তা কর যে, হরিহর শিবশঙ্কর গয়াগঙ্গাগদাধর, স্মরণ করিয়া পঞ্চভূতের উদ্ধার নিমিত্ত এই দেহপিণ্ড দান করিয়া নিবৃত্তিলাভ করি।

সমাপ্ত।

উপসংহার।

চলিলাম বন্ধুগণ! আজি দেশান্তরে,
দেহ-তরী পাপপূর্ণ হ'ল এতদিনে।
ছুটিল মায়ার ডোর, মমতা-নোঙ্গর
উঠিল, ভাসিল কিস্তি, করে টলমল।
পেতেছি সঙ্কেত যত, যাইবার তরে
কম্পিত হতেছে তত, অন্তর আমার।
কি জানি কিসের লাগি, এরূপ ভীষণ
ভয়ের সঞ্চার হৃদে, অস্থির শরীর।
ধিক্ ধিক্ কেন মন! হও আলুথালু?
ধৈর্য্য-হাল ধর করে, কি ভয় তুফানে?
যখন খুলেছি কিস্তি, হরি দুর্গা ব'লে,
দুর্গতি পাব না কভু, সজাগ থাকিলে।
সদা হৃদে জাগিতেছে এ দৃঢ় বিশ্বাস,
হতাশ্বাস হইবার না হেরি কারণ।
যতক্ষণ বহে দেহে জীবনের ধার,
সাধ কাজ যথাবিধি ভক্তি করি সার।

মুক্তকণ্ঠে ডাক সদা বৈকুণ্ঠ-নাথেরে,
কর্ণধার তারিবেন দুস্তর পাথারে।
নরকের ঘাট ছাড়ি কোন পুণ্যতটে
লাগাবেন তরী মোর, শ্রীহরি কাণ্ডারী।
জান ত কাণ্ডারি! মোরে সম্বলবিহীন,
খেয়া-কড়ি দিতে নারি. অতি অকিঞ্চন।
নিবেদন সবিশেষ শুন কর্ণধার!
গুণলেশ নাহি পা'বে করিলে সন্ধান।
গুণ অন্য চা'হ যদি এই অভাজনে,
হৃদয় খুলিয়া দেখ অন্তর্য্যামী তুমি।
মহাভাবে প্রেমাবেশে অনুরক্ত তব
গুণগান-সুধা পান করি হে নিয়ত,
ত্রিতাপ-তপনে দগ্ধ হতেছি এখানে,
পড়েছি বিপদে নাথ। ভীষণ তুফানে।
বিপদ্‌ভঞ্জন হরি! আমি হে বিপন্ন,
দয়াময়! এ সময় হও হে প্রসন্ন।